

চিত্তাপ୍ରবাহିନୀ ।

— — — — —
প্রথম ভাগ ।
— — — — —

শ্রীপ্রিয়নাথ দাস কতৃক

প্রকাশিত ।



কলিকাতা

সংস্করণ

দ্বিতীয় ।

— — — — —
সন ১২৯৪ ।

উপহার ।



দর্শনশাস্ত্রাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনাথায়ণ

পাল অগ্রজ মহাশয় সমীপে

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনম্

আমি যদি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কিছু মাত্র
চিন্তাশক্তির পবিচয় দিতে সমর্থ হইয়া থাকি,
তাহাব মূল কারণ আপনি। ইহা মাবগর্ভ বা
আপনাব পঠযোগ্য না হইলেও স্নেহপাত্রলিখিত
বলিয়া অবশ্য আপনাব আদবের বস্তু হইবে, এই
আশায় সাহসী হইয়া আমি ইহা আপনাব কর-
কমলে অর্পণ কবিতাম ইতি ।

প্রণত

শ্রী—

চিন্তাপ্রবাহিনী ।



প্রেমবিষয়ক প্রথম পত্র ।

ভাই প্রমদাচরণ । তুমি এক দিন আমাকে বলিয়াছিলে, হাই সর্বোচ্চ । আমি অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, জ্ঞানই মনের আলোক, মনের আলোকই মনের সুখ, অজ্ঞানই মনের অন্ধকার, এবং মনের অন্ধকারই মনের দুঃখ । ভাই । মন বাহ্যতে আলোকিত না হয় তাহা অবশ্য বর্জন কবিও এবং বাহ্যতে মন আলোকিত হয় তাহা অবশ্য পালন কবিও ।’

তোমার এই কথিত জ্ঞান আমি প্রথমে বিশ্বাস কবি নাই, তাব পবে স্বাধীন ভাবে চিন্তা কবিয়া বিশ্বাস কবিয়াছি । আমি প্রথমে তোমার কথিত জ্ঞান স্বাধীন ভাবে চিন্তা না করিয়া বিশ্বাস করি নাই বলিয়া তুমি ঈর্ষিত হইবে না, বরং অতি সুখী হইবে । কারণ তুমি এক দিন তোমার কোন বন্ধুর নিকট বলিতেছিলে “জ্ঞান কাহাবও একচেটিয়া নয়, উহাতে সকলের অধিকার আছে । যিনি স্বাধীন ভাবে জ্ঞান লইবেন, উহা তাঁহারি হইবে । স্বাধীন ভাবে চিন্তা না করিয়া যিনি পাবের কথা বিশ্বাস করিয়া জ্ঞান লইতে চান, তিনি উহা লইতে পাবেন না । যিনি পাবের

কথায় বিশ্বাস করেন, তিনি পরমতাবলম্বী । যিনি পরমতাবলম্বী তিনি মনোজগতের নিয়মানুসারে জ্ঞান গ্রহণ করিতে পারেন না । যিনি পরকথিত জ্ঞানকে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া গ্রহণ করেন, তিনি মনোজগতের নিয়মানুসারে জ্ঞান গ্রহণ করিতে পারেন, এবং তিনি স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া জ্ঞান গ্রহণ করেন বলিয়া স্বাধীনমতাবলম্বী , কারণ তিনি পরের কথায় বিশ্বাস না করিয়া স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া গইয়াছেন ।’

তাই । তুমি আমার কাছেও সহস্র সহস্র বার বলিয়াছ “পরমতাবলম্বী হইও না, পরমতাবলম্বী হইলে স্বাধীন চিন্তা লুপ্ত হয় , স্বাধীন চিন্তাই আস্রাব চিন্তা, সুতরাং স্বাধীন চিন্তা লোপ পাইলে আস্রাবও লোপ পাইবে না কেন ? স্বাধীন চিন্তার মানসভাব এবং আত্মবিকাশের একমাত্র উপায় ’

আরও তুমি বলিয়াছিলে “যদি তুমি জগতের প্রকৃত মহালাকাঙ্ক্ষী হও, তাহা হইলে জগতের স্বাধীন চিন্তার প্রতিবন্ধকগুলি প্রাণপণে তাড়াইবার চেষ্টা কর এবং চেষ্টায় কৃতকার্য হইয়া স্বাধীন চিন্তার স্রোত খুলিয়া দেও, দেখিবে জগৎ মানন্দস্রোতে তাসিতেছে । তাই । কদাচ কাহাকেও আপনমতাবলম্বী কবিও না ।’ তজ্জন্ত আমার বিশ্বাস আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি নাই এবং উহা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়াছি বলিয়া তুমি অতি স্তবী হইবে ।

সে যাহা হউক এক্ষণে আমি তোমাকে একটী কথা প্রস্তাৱ করিতে ইচ্ছা করি । আমার প্রত্নবিষয়টী পুরাতন, তাহা গড়ে বাটে, বিপিনে, বেঙ্গাগৃহে ইত্যাদি স্থানে এবং প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যায়, নিশীথে, ইত্যাদি সর্ব সময়ে.

কবিব কাব্যে, যুবক যুবতীর আলাপনে, বালকের ক্রীড়ায় ইত্যাদি সর্বকাৰ্য্যে তাহা আলোচিত হইতেছে । উহা পুৰাতন হইলেও উহাকে সকলে পাইবার জন্য লালারিত, সকলের চক্ষে উহা চিবনুতন এবং এক অপূৰ্ণ সুখদায়ক পদার্থ, ঐ পদার্থের নাম ভালবাসা । উহা কিপ্রকার ? সহজাত কি পরের নিকট শিক্ষণীয় ? উহা কি কি প্রকাৰে উদ্ভিক্ত হয় ইত্যাদি বিষয় তোমার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি ইতি । ১২৯২ সাল ।
 ০ই ফাস্তুন ।

তোমার

শ্রীসবোজকুমার সেন ।

তত্ত্বত্তব ।

ভাই সুরোজ । তোমার পত্র আগ্রহেব সহিত পাঠ করিয়া অতি আনন্দিত হইবাছি, এক্ষণে তোমার পত্রেব উত্তর দিতে চেষ্টা করিতে আবস্ত করিলাম ।

প্রথম কথা—ভালবাসাব স্থান কোথায় ?

যখন আমাদের ভালবাসাব উদ্ভেক হয়, তখন আমাদের মস্তিষ্ক ও বক্ষের ভিতর আলোকিত হয় । আমি এক দিন এক গানি উপনিষদের একটা শ্লোকের বঙ্গানুবাদ দৈখিবাছিলাম । একটা বৃক্ষ বহিবাছে, তাহাতে দুইটা পক্ষী থাকে ; একটা উচ্চশাখায়, আর একটা নিম্নে । উচ্চশাখায় যে পক্ষীটা বহিয়াছে, সে আনন্দে ফলাহরণ করিয়া নীচেরটিকে দিতেছে ; উহা নীচেরটা আহ্লাদিত হইবা ভক্ষণ করিতেছে । উপরে-

বটী কার্যে বিব্রত, আব নীচেরটী নিশ্চেষ্ট ।” আমার জানেও উহাই মন প্রাণ, উচ্চেরটী অর্থাৎ মস্তিষ্কের ভিতবটী মন, আব নীচেরটী অর্থাৎ বক্ষের ভিতবটী প্রাণ, মন কার্যে বিব্রত. কার্যের ফলাহরণ করিবা নিশ্চেষ্ট প্রাণবে ছেদ প্রাণ তাম্র বাইরা ফলানুসায়ে চুঃখ কিংবা সুখ পাইয়া থাকে। ভালবাসা ঐ দুই স্থানে আলোকিত হয়। উহাদের পরস্পর গাঢ় প্রেম আছে, সুতরাং উহারা অভিন্ন এবং উভয়ে এক স্বাভাবিকী, এবং স্বাভাবিকী না হইলে উহাদের প্রেম হইত না, সুতরাং ভালবাসা পদার্থ উহাদের উভয়েই আছে। উহারা (মন প্রাণ) যে ভালবাসা নয় তাহা বা কি বলিয়া বলি, কারণ যখন উদ্ভিদকে আলোকিত হইতে দেখি তখন দেখিতে পাই উহারা স্বাভাবিক রূপে উদ্ভিত হইয়াছে এবং উহাদের স্বাভাবিক শরীরের শত্রু পাপ মলিনতা দূর হইয়া গিয়াছে।

যখন অশিক্ষিত শিশুও চান্দ শিশু প্রভৃতি সুন্দর ও সমৃদ্ধ পদার্থকে ভাল বাসে, তখন কি বলিয়া বলিব, উহা শিক্ষণীয় বৃত্তি সহজাত নয় ? কেহ কেহ বলিতে পারেন, বাহ্যিক জগৎ হইতে সুন্দরতা আসিয়া শিশুর মনে ভালবাসা ভাব ঘটাইয়া দিয়া থাকে, নচেৎ ভালবাসা বলিয়া আন্তরিক কোন পদার্থ নাই। তাঁহাদের প্রেমের এই উক্তর বলিলে যথেষ্ট হইবে যে আমাদের চক্ষু আছে বলিয়া আমরা দর্শনেন্দ্রিয়ার কার্য করিয়া থাকি তাহাদের চক্ষু নাই তাঁহারা কি দর্শনেন্দ্রিয়ার কার্য করিতে পারেন ? যেমন অন্ধব্যক্তি দর্শনেন্দ্রিয়ার কার্য করিতে পাবে না সেই প্রকার শিশুদের যদি সুন্দর প্রণয়বৃত্তি অর্জবে না যদি তাহা হইলে কখন তাহারা প্রণয়লিপ্সার জগতে সমর্থ হইবে

পদার্থ খুজিয়া বেড়াইত না এবং পাইয়া আনন্দ লাভ করিত না । তাহাদের প্রাণ সেই সমস্ত সুন্দর থাকে বলিয়া এবং তাহাদের প্রাণের ধর্ম প্রণব বলিয়া তাহারা চাঁদ, আলোক, শিশু প্রভৃতি সুন্দর ও সমধর্ম্য পদার্থের সহিত প্রণব করে । দেখ যখন তাহাদের সে বৃত্তি কালক্রমে কোন কারণে ঢাকা পড়িয়া যায়, তখন জগতে সেই সমস্ত সুন্দর ও সমধর্ম্য পদার্থ থাকা সত্ত্বেও সেই সমস্ত পদার্থের সমধর্ম্য ও সুন্দরতা তাহারা অনুভব করিতে পারে না, সুতরাং দেখিয়াও দেখে না ও প্রণব করে না । কারণ ঐক্কেণে তাহাদের অন্তর্ভাবের প্রাবল্য হয় এবং তাহা প্রাবল্যানুসারে পদার্থ চর্চন করিয়া প্রণব করিয়া দেবে ।

এতদ্ব্যতীত দেখাইলাম । ইহাও উপর যে তর্ক করে, সে সত্যসংশয়ী মহাপাপী । সে মহাপাপী আকাশে গৃহ নিৰ্মাণ করিতে চলে, কিন্তু সত্যবলে বসীমানের নিকট পলায়ন হইয়া পলাইয়া যায় । ভাই । মিথ্যা ছন্দল, সত্য শক্তি বস্তু । সত্যসংশয়ী মহাপাপীকেও সত্যসংশয়ের অভিপ্রায়ে বিভিন্ন সত্যের আশ্রয় লওয়া বলাগানু হইতে হয়, অর্থাৎ যে সমস্ত সত্যের সহিত বচ্য সত্যের কোন সামঞ্জস্য থাকে না, তাহার আশ্রয় লইতে হয়, কিন্তু সত্যবলে বসীমানের নিকট জ্ঞান ছিল হইলে পলাইয়া যায় ।

ভালবাসা, সুন্দর, উজ্জ্বল, শক্তি ও নজর । অন্তর্কে আপনাব মত দেখিয়া বা অনুভব করিয়া সুতরাং অন্তর্কে আপন করিয়া অন্তের উপকার কর উহার দৃশ্য বস্তু উহা স্বপ্ন, সুন্দর, উজ্জ্বল, পরিষ্কার ও মহত ।

ইহার আর একটি প্রধান ধর্ম অশ্লষ্ট রূপে উক্ত হইয়াছে এই যে, উহা আপন সমধর্মী না হইলে মিশে না, এবং সমধর্মী না দেখিলে অজ্ঞানাজ্ঞমতা দূর করিয়া মিশিতে বাধ না ।

নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকারে ভালবাসা উদ্ভিজ্জ হইয়া থাকে ।

১। সমধর্মোপিত । তুমি যদি পরোপকারী, সত্যবাদী, স্বাধীনচেতা প্রভৃতি হও, তাহা হইলে অন্ত এক জনকে পরোপকারী, সত্যবাদী, স্বাধীনচেতা প্রভৃতি দেখিলে তোমাব ভালবাসার উদ্বেক হইবে । ঐ ভালবাসাই সমধর্মোপিত ।

২। কপোপিত । ভালবাসা সুন্দর, উহা অপবকে আপ-
নার মত সুন্দর দেখিলে ভালবাসে, সুতরাং কপ দেখিয়া ভাল-
বাসার উদ্বেক হয় । কাবণ কপ সুন্দর । পূর্বের ইহাও বলা
হইয়াছে উহা সমধর্মী না হইলে ভাণ বাসে না । এই কাবণে
এক জনেব বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখিয়া তাহার আন্তরিক সৌন্দর্য
সজীব পদার্থ অনুমান কবিয়া তবে প্রকৃত ভালবাসে । কাবণ ইনি
স্বয়ং আন্তরিক সজীব সুন্দর পদার্থ, সুতরাং সমধর্মী না দেখিলে
ভালবাসেন না । এই কারণে ভালবাসা কুংসিত ব্যক্তিরও
আন্তরিক সৌন্দর্য দেখিলে আপনাব অংশ ভাবিয়া ভালবাসে ।
এই কাবণে সুবতীর বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখিয়া সুবক স্বীয়মন-জদধেব
প্রেম সুবতীর আন্তরিক সজীব সুন্দর পদার্থ অনুমান কবিয়া
তাহাকে ভালবাসে, কিন্তু যখন সে সুন্দরী সুবতীর আন্তরিক কুং-
সিত কপ দেখে, তখন সুবকের ভালবাসা অন্তর্হিত হইয়া যায় ,
কারণ সুবকের ভালবাসা আন্তরিক সজীব সুন্দর পদার্থ, সুবতীর
কপ বাহ্যিক নির্জীব, তাহা আন্তরিক সজীব সুন্দর পদার্থ নয় । তাই ।
যাহারা বাহ্যিক কপ দেখিয়া আন্তরিক সজীব পদার্থের কপ অনুমান

করিয়া প্রথমে ভালবাসে, শেষে তাহাদিগকে প্রায় কাঁদিতে হয় । যদি ভালবাসার ধর্ম চরিতার্থ করিতে চাও, আন্তরিক রূপ দেখিয়া ভালবাস অথবা অন্তের আন্তরিক সজীব পদার্থের রূপের বিকাশ করিতে চেষ্টা কর, চেষ্টার অসাম্য কার্য্য নাই, সফলকাম হইবে, তোমার ভালবাসা বৃষ্টি অন্ত্রান্ত্রের অন্তরের ময়লা-নিবারণের আবস্ত কার্য্য হইতে শেষ কার্য্য পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিতে থাকিবে । আবস্ত কার্য্য হইতে শেষ পর্য্যন্ত তোমার মনে কার্য্যানুসারে সর্গবাস্য বিস্তার হইতে থাকিবে ।

৩। গুণোন্নিত । গুণ বাহা তাহাই আন্তরিক সজীব পদার্থের রূপাদি, সুতরাং প্রেম-ধর্ম্মানুসারে গুণ দেখিয়া ভালবাসার উদ্রেক হইয়া থাকে । ষত দিন গুণ থাকে তত দিন গুণজাত ভালবাসা থাকে, গুণ অদৃশ্য হইলে উহা তৎসঙ্গে চলিয়া যায় । আমি আমার স্বার্থের জন্ত নিজেব স্বার্থ বলি দিতেছি দেখিয়া যে ভালবাসার উদ্রেক হয়, তাহাই গুণোন্নিত ।

৭। জ্ঞানোন্নিত । চিন্তা দ্বারা যখন আমরা জানিতে পারি, আমরা ষতপ্রকার জীব এই জগতে বাস করি, সকলেই এক প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছি । প্রকৃতিব যে যে উপাদানে অবস্থিতি বা সুবেশ নিশ্চিত হইয়াছে, সেই সেই উপাদানে মিসেস মেবি বা মিশ্ গর্ডন্ নিশ্চিত হইয়াছে । তবে দেশানুসারে ভৌতিক উপাদানের পরিমাণ কম বা বেশী হইতে পারে মাত্র । আর অবস্থিতি বা সুবেশ, মিশেশ মেবি বা মিশ গর্ডন্ যে যে ভৌতিক উপাদানগুলির যেকোন মাত্রার সংযোগের ফলে নিশ্চিত হইয়াছে, আবার সেই সেই ভৌতিক উপাদান সেই-রূপ নিয়মে সংযোগ না হইয়া বিভিন্ন মাত্রার সংযুক্ত হইয়া

মানব ব্যতীত অজ্ঞান জীব খুঁট হইতেছে। এইরূপে প্রকৃতির ভৌতিক উপাদানগুলিতে জগতের সমস্ত পদার্থ নিখুঁত হইতেছে, এবং তাহা সংযোগহীন হইয়া পুনর্বার স্ব স্ব স্থানে আসিতেছে, অর্থাৎ তেজে তেজ, জলে জল ইত্যাদি ভূতে ভূত মিশিতেছে। এই জ্ঞানে অর্থাৎ ভৌতিক মাত্রার কম বা বেশী কারণে বাহ্যিকে কতক ভিন্ন হইলে মূলে আমবা সব এক প্রকৃতির সম্ভান জানিয়া বে প্রেমের উদ্ভক হব, তাহাকে জ্ঞানোদিত ভালবাসা বলে। এই ভালবাসা স্থায়ী, ইহাই বিশ্বপ্রেম। ভালবাসার পাত্রেবা যদি অজ্ঞানবশতঃ বিশ্বপ্রেমিকেব উপব অসংখ্য অত্যাচার কবে, তথাচ বিশ্বপ্রেমিক মনে কবেন “উহাদের শরীরে এমন একটা পদার্থ আছে যিনি আমাবই মত, যিনি আমাবই আত্মার অংশ, যিনি বিশ্বপোষক, স্নান, পারিত্র, শাস্তিময় ইত্যাদি, তিনিই ইহাদের শরীরের প্রভু। বে অজ্ঞান আমার ও ইহাদের অন্তরের উপব অত্যাচার করিতেছে, সে অজ্ঞান উহাদের আত্মা নব, বন্ধু নব, শত্রু। ঐ শত্রুব বশবস্তী হইয়া আমার উপব অত্যাচার করিতেছে ভাবিয়া এক সময়ে উহার আত্মগ্লানিতে দগ্ন হইবে।

তাই ' দেখ জ্ঞানীব আবা্যদেব বিশ্বপ্রেমিক মহাত্মা যীশুকে ইহুদিরা যখন ক্রুশে বিদ্ধ করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিল, তখন তিনি ঐ কথা ভাবিয়াছিলেন না? মহাত্মা চৈতন্যকে যখন জগাই মাধাই মাঝিয়াছিল, তখন তিনি ঐ কথা ভাবিয়াছিলেন না? সত্য সত্যই যীশুশত্রুদিগের ও জগাই মাধায়ের মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে এক সুন্দর পদার্থ ছিল না? এবং তাহারা শেষে আত্মগ্লানিতে দগ্ন হইয়াছিল? খৃষ্ট-শত্রু ও জগাই মাধাই উভয়ের

ঘটনায় দেখিতে চেষ্টা কর, আমার ঐ কথিত জ্ঞান দেখিতে পাইবে। বীণ ও চৈতন্যের নিকট প্রমাণ হইল জ্ঞানোদিত ভাল-বাসা ভালবাসার পাত্রদিগের গুণ না দেখিলেও গুণ আছে জানিয়া ভঙ্গ হয় না, এবং ভালবাসার পাত্রদিগের গুণ আছে বলিয়া যে তাঁহারা বিশ্বাস কবেন তাহা যে সম্পূর্ণ সত্য বিশ্ব-প্রেমিকেরা জগতে সৰ্ব্বক্ষণ তাহা দেখাইতেছেন। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, জ্ঞানোদিত ভালবাসা সৰ্পকে হৃদয়ে স্থাপন করিবে কি না ? এবং প্রাণনাশক ভৌতিক পদার্থগুলিকে সাহসে গ্রহণ করিবে কি না ? কেন করিবে না, তাঁহারাও ত ঐকৃতি-জননীৰ পুত্র, বা প্রকৃতি-জননীৰ অংশ।

তাই। অহঙ্কার কথিয়া বলিতে পারি, ভালবাসা নির্দোষ পদার্থ। ইহা নির্দোষ কি না জ্ঞানোদিত ভালবাসার নিয়ম বলিয়া দিলে বুঝিতে পারিবে।

জ্ঞানোদিত ভালবাসার নিয়ম এই “আমরা সব এক প্রকৃতির সন্তান, সুতরাং আমরা এক, আমবা যেখানে সব এক হইলাম, সুতরাং আমাদের পবম্পব মঙ্গলচেষ্টা ধর্ম হইয়া উঠিল। মঙ্গল-চেষ্টা কি ? দোষমুক্ত কবা, সুতরাং আমাদের যাহা দোষ তাহাকে ধ্বংস কবাই জ্ঞানোদিত ভালবাসার ধর্ম। জ্ঞানোদিত বিশ্বভালবাসা বলিলে বিশ্বের দোষকে ভালবাসিতে পাবা যায় না, অথচ তাহাকে শত্রু জ্ঞান কথিয়া দূরীকরণ করাই উক্ত ভালবাসার ধর্ম বুঝিতে হয়, সুতরাং বিশ্বভালবাসা বলিলে বিশ্বের দোষকে ভালবাসিতেও হইবে ইহা বুঝা ভ্রম। ভাল-বাসা যেখানে বহিরাছে, সেখানে দোষকে ভালবাসা যায় না, কারণ ভালবাসার ধর্ম দোষ ধ্বংস করা, সুতরাং জ্ঞানোদিত

বিশ্বভালবাসা বলিলে বিশ্বের দোষ-নিবারণের উদ্দেশ্য বুঝিতে হয়, দোষকে ভালবাসা বুঝিতে পারা যায় না ; কারণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, ভালবাসার অপর নাম দোষশত্রু । দোষশত্রুকে দোষমিত্র বুঝা মহাভ্রম । পূর্বেই বলিয়াছি, ভালবাসা হৃন্দর, আপন সমধর্ম্মী হৃন্দর পদার্থ ভিন্ন অন্য হু পদার্থের সহিত প্রাণান্তেও মিলিত হয় না । ভালবাসার সাধারণ এই ধর্ম্ম থাকিবার জন্য জ্ঞানোদ্ভিত বিশ্বভালবাসাও বিশ্বের মন্দ পদার্থকে প্রাণান্তেও ভাল বাসিবে না, অথচ শত্রু জ্ঞান কবিয়া তাহাব ধ্বংস করিবার চেষ্টাই তাহাব ধর্ম্ম, সুতরাং জ্ঞানোদ্ভিত ভালবাসার বিশ্বের দোষকে ভালবাসার নিষম নাই ।

আমরা সব এক প্রকৃতির সত্তান জানিলে একভাবে শত্রু অজ্ঞানতা মন হইতে বাইয়া বিশ্বভালবাসার উদ্বল হইলে আমাদেব মন ও প্রাণ অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হয় । তবে বিশ্বভালবাসা প্রাণ ও মন না হইবে কেন ?

ঐ প্রাণ বা বিশ্বপ্রেম হৃন্দর । পূর্বেই বলিয়াছি, ভালবাসাব ধর্ম্ম আপন সমধর্ম্মীর সহিত মিলন করা, এবং বিধর্ম্মীপদার্থকে নাশ করা, সুতরাং “ভ্রমজ্ঞান” যদি অনিষ্টকর পদার্থকেও এক প্রকৃতির সত্তান বলিয়া হু পদার্থকে ভালবাসা জন্মাইয়া দিতে চায়, তখাচ ভালবাসা উক্ত-ধর্ম্মানুসারে কখনই হুপদার্থকে গ্রহণ করিবে না, এবং উপকার-ধর্ম্ম বিকাশও করিবে না ; “হু জ্ঞান” ঘোরে তাহা মরিয়া বাইবে । হুপদার্থ যে বিশ্বভালবাসার বা ভালবাসার আপনার পদার্থ নয় এই ঘটনার বিবেচনা কর এবং হুপদার্থ যে ভালবাসা পদার্থ এই ঘটনার ইহাও বিবেচনা কর । অজ্ঞানে জ্ঞানোদ্ভিত ভালবাসার উদ্ভেক হয় না, যে

জ্ঞান উদ্ভেক হয়, তাহাকে জ্ঞানোদ্ভিত ভালবাসা বলিয়াছি ।
বাহ্যরায়ণ প্রভৃতি মহাত্মাদের ভালবাসাকে আমি জ্ঞানোদ্ভিত
বিশ্বভালবাসা বলিয়াছি ।

৫। স্বতঃসিদ্ধ । আর একটা ভালবাসা রহিয়াছে, তাঁহাকে
নিষ্কারণোজ্জিত ভালবাসার মত বোধ হয় । বাহ্যিক দৃষ্টিতে
ঐ ভালবাসা যেন রূপ, গুণ বা সকলকে আপন জানিয়া
উৎপন্ন হয় না । সকলপ্রকার স্বার্থের উপর এই প্রেমটীর ভয়া-
নক ছেদ ।

এই প্রেমটী ভাবেন, এক জনের রূপ বা গুণ আছে বলিয়া
বা সকলে আপনার বলিয়া ভালবাসিব, নচেৎ ভাল বাসিব না ?
রূপ, গুণ থাক্ বা না থাক্ অবশ্য ভালবাসিব ; রূপ, গুণ ও
সকলকে আপন দেখিয়া যদি ভালবাসি, তাহা হইলে স্থপিত
স্বার্থের বশীভূত হইব, এই জন্ত ইহা নিঃস্বার্থ হইয়া ভালবাসে ।
এই প্রেমটী মানসিক সত্যের (আলোকের) ভিত্তির উপর স্থাপিত
এবং উহা মানসিক-সত্যপ্রিয় । বাহ্যতে মানসিক সত্যের বিশ্ব
হয়, তাহারই উপর উহার ভরানক ছেদ । মানসিক-সত্য-প্রিয়-
তার কারণে উহার “সকলে এক” জ্ঞানটী বড় প্রবল , কারণ
“এক জ্ঞান” মানসিক সত্যের (আলোকের) প্রধান কারণ । “সকলে
এক” জ্ঞানের বিরুদ্ধে যদি কেহ কিছু বলেন, এই ভালবাসা
বড় ব্যথা পায়, এবং বহু চিন্তা করিয়া বহু-চিন্তা-জনিত আয়াস
করিয়া “আমরা সকলে এক” ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পায় ।
যদি কেহ কূটতর্কে প্রতিপন্ন করিতে বলেন “জীব বিভিন্ন” । ঐ
প্রেম তর্কে পরাভূত হইলেও ভাবেন সত্য হউক বা মিথ্যা হউক
তাহা আমার জানিবার প্রয়োজন নাই । বাহ্য মানসিক অসত্য

(অন্ধকার) তাহাকে অসত্য ভাবিব এবং বাহ্য মানসিক সত্য (আলোক) তাহাকে সত্য ভাবিব । “জীব এক” ভাব না ভাবিলে আমার মন ও হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, সুতরাং “জীব বিস্ত্র” ভাব ভাবিব না ।

বারংবার বক্তব্য বলিয়া উক্ত হইতেছে, ভালবাসা হৃদয়ের পদার্থ, উহা সমর্থন্য না হইলে ভালবাসে না, ইত্যাদি ভালবাসার যে ধর্ম পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইহার ভালবাসা নাম হইয়া সেই সমস্ত ধর্মে বঞ্চিত হইবেন কেন ? বঞ্চিত না হইবার কারণে এই ভালবাসাও “কু” কে দেখিতে পারে না, “কু” ধ্বংস কবিস্বর চেষ্টা পায়, ও আপন সমান না হইলে মিশে না, সুতরাং আমি এই ভালবাসাকে অপ্রকাশিত-জ্ঞানোন্মিত ভালবাসা বলিতে পারি । এ প্রেমটীও যে “অপ্রকাশিত-জ্ঞানোন্মিত” প্রেম, তাহাব কোন সন্দেহ নাই । দেখে ভাই । যেখানে ইহা মনের অজ্ঞাতে অস্পষ্ট বাহাদিগকে আপনার মত না দেখেন, বাহাদিগকে পবিত্র হৃদয় না দেখেন বা অজ্ঞানচ্ছন্ন না ভাবেন তাহাদিগকে উহা ভালবাসেন না । সেখানে উহা অপ্রকাশিত-জ্ঞানোন্মিত প্রেম নয়ত কি ? জ্ঞানোন্মিত প্রেমে আর এই প্রেমে প্রভেদ এই যে “জ্ঞানোন্মিত প্রেম” পরিষ্কার করিয়া অজ্ঞান জীবদেহের প্রাণকে ও ভৌতিক পদার্থ-সমূহকে আপনার জিনিষ দেখিয়া উদ্ভিত হয় । এ প্রেম আপনার সদৃশ দেখিয়া উদ্ভিত হয় বটে, কিন্তু মনে “এক জ্ঞানের” আলোকে স্পষ্ট আলোকিত হয় না এইমাত্র প্রভেদ । আমি দেখিয়াছি, পণ্ডিতের অনেক সত্য মূর্খেরা হৃদয়ঙ্গম করে, কিন্তু তাহার কাব্য জানে না । এ কারণে মূর্খদের মন

জ্ঞানালোকে আলোকিত হয় না। ঐ যে মেঘ ডাকিতেছে, উহা পণ্ডিত ও মূর্খের কর্ণে একপ্রকার ধ্বনিত হইতেছে। শব্দ যে কি প্রকারে অশ্রু, তাহা পণ্ডিত উত্তমরূপে জানেন, সুতরাং পণ্ডিতের মন জ্ঞানালোকে আলোকিত। মূর্খ শব্দের কারণ জানে বটে, কিন্তু পরিষ্কৃতরূপে জানে না। মূর্খ তাহা হৃদয়ের সহিত জানিলেও তাহার প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। মূর্খ জানে কি না তাহা এই ঘটনার দ্বারা দেখ। তুমি যদি এক মূর্খকে শব্দের উৎপত্তির বিষয় জিজ্ঞাসা কব সে তাহা বলিতে পারিবে না অথচ শব্দের কারণ বর্ণন নর একথা বলিলেও সে বিশ্বাস কবিবে না। এই অপ্রকাশিত-জ্ঞানোন্মিত প্রেম তাহাই। উহা সকলকে আপনার আনিয়া উদ্ভিত হয় বটে, কিন্তু তাহা পরিষ্কার পূর্বক জানে না।

ভাই! পাঁচপ্রকার প্রেমের বিষয় বলা হইল। সকল-প্রকার প্রেমের নিকট আমরা এই জানিতে পারি, বাহাদিগকে আমরা ভালবাসি জাহারা আমাদের আত্মার অংশ, কাবণ পূর্বেই বারংবার বলিয়াছি যে প্রেম অস্ত্রকে আপনার বলিযা না জনিলে উদ্ভিক্ত হইয়া ভালবাসেন না, অর্থাৎ আপনার জ্ঞান না করিয়া মিলিত হন না। আমরা আবও একপ্রকার জানিতে পারি যে প্রেমই আমাদের প্রাণ। দেখ, সকলপ্রকার অজ্ঞান বা অজ্ঞানোদ্ধৃত্তি আমাদের মস্তিষ্ক হইতে দূরীভূত হইলে অবশিষ্ট প্রেমমাত্র থাকে। যদি অজ্ঞান বা অজ্ঞানোদ্ধৃত্তি-মহুহ প্রাণ হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান ও অজ্ঞানোদ্ধৃত্তি দূরীভূত হইলে শরীরে জীবন বলিয়া কোন বস্তু থাকিত না, এবং অবশিষ্ট প্রেম-প্রাণ যদি প্রাণ না হইত, তাহা হইলে প্রেম কখন

জীবন বলিয়া পরিচয় দিতে পারিত না, এবং প্রেমকে তাড়াই-
 বার চেষ্টা করিলে তাড়ান বাইত, কিন্তু উহাকে তাড়াইবার চেষ্টা
 করিলে তাড়ান বাব না, কেবল অজ্ঞান ও পাপে ঢাকা থাকে
 মাত্র । এই কারণেও প্রেমকে প্রাণ বলিয়া পরিচয় দিতে কে না
 সাহস করে ? প্রাণ যদি পবিত্র হয়, আপনার প্রকৃতমঙ্গলাকাজক্ষী
 হয়, তাহা হইলে প্রেমই ত প্রাণ । কোন সম্ভাব্য বস্তু আপনার
 অমঙ্গল আপনি ইচ্ছা করে ? বা কোন্ বস্তুর ধর্ম (গুণ) আপ-
 নার অমঙ্গল পদার্থ ? অজ্ঞান বা অজ্ঞানোদ্ভূত-বৃত্তি-সমূহ যদি
 দেহের ও মস্তিষ্কের অনিষ্টকারী পদার্থ হয়, তাহা হইলে তাহা
 প্রাণ নহে এবং তাহা যে প্রাণের শত্রু, এ কথা সকলে সাহস
 করিয়াও বলিতে পারে । আপনার অনিষ্ট কে কবে সাধন
 করে ? যদি না কবে, অজ্ঞান বা অজ্ঞানোদ্ভূত-বৃত্তি-সমূহ প্রাণ
 নহে, সুতরাং শরীরের ও মস্তিষ্কের ইষ্টকারী পদার্থই প্রাণ এবং
 সেই ইষ্টকারী পদার্থই প্রেম । এই সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রেম
 যদি প্রাণ হইল, তবে এস ভাই সকল । আমরা সকলকে ভাই
 ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করি, এস আমরা সকলে ভ্রাতাদের রূপ-
 সংযুক্ত গুণ ও আন্তরিক রূপ প্রভৃতি (গুণ) দেখিয়া ভালবাসি, আর
 যে সমস্ত ভ্রাতার আন্তরিক রূপাধি (গুণ) অজ্ঞানোদ্ভূত বহিয়াছে,
 প্রাণপণে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করি । পূর্বেই বলিয়াছি
 “জ্ঞানোন্মিত প্রেম বা অপ্রকাশিত-জ্ঞানোন্মিত প্রেম অর্থাৎ
 জ্ঞানগুণকে প্রকাশে বা মনের অপ্রকাশে আপন বলিয়া জানা
 মিথ্যা নয় । যখন বাহ্যায়ণ, চৈতন্য, ধৃষ্ট, সঙ্ক্রেতিখ প্রভৃতি
 মহাম্ভার ঐ দুইটী প্রেম চালিত হইয়া সকলকে ভাই ভাই
 বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং ভাইদ্বিধকে অজ্ঞানোদ্ভূত

হইতে মুক্ত করিতে অশেষ চেষ্টার ফলে কৃতকার্য হইল, ইহারা সকলে যে ভাই ভাই ইহা জগতের নিকট প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, তখন আব্রাহামের সন্দেশ করিয়া আত্মাকে জীবন্ত করিবার প্রয়োজন কি? সকলকে ভাই ভাই না ভাবিলে ও ভাবিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের চেষ্টা না করিলে আত্মা সম্পূর্ণরূপে বিকাশ হইয়া প্রকৃত সুখ লাভ কবিতে পারে না। বাহ্যিক জাগতিক সত্যের সহিত বর্ধন আন্তরিক সত্য মিলিতেছে, তখন আর কে কৃত্তার্কিককে ভয় করিবা থাকিবে? এক মানসিক সত্যের (প্রেমের) কেহ সমকক্ষ নর, তাঁহার সহিত বর্ধন জাগতিক সত্য মিলিযাছেন, তখন আর অন্তকে ভয় কি?

রাম মিথ্যা কথা কহিতেছে। স্পষ্ট দেখ, বামের সত্যপ্রিয় আত্মায় সত্য লুকাইয়া রহিয়াছে এবং মিথ্যা অজ্ঞানে সত্যকে ঢাকিয়া রাখিতেছে। এইপ্রকার সমস্ত অজ্ঞান ও পাপ মন্ত্ৰি-স্থিত আত্মার বিরুদ্ধে যে কার্য্য করিতেছে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। রামের ঐ পাপ ও অজ্ঞান ঘাইতে পারে, কিন্তু সত্যাদি-গুণাবলী আত্মা ঘাইতে পারে না, কেবল পাপে ঢাকা থাকিতে পারে মাত্র, অথবা নিষ্পাপ হইয়া বিকাশ হইবে মাত্র। তবে আর পাপ অজ্ঞানকে আত্মা বল কেন? ভাই ভাই বলা আত্মার ধর্ম্ম এবং সমস্ত-গুণ-বিকাশের প্রধান কারণ; তবে আর নিশ্চেষ্ট কেন? ভাই ভাই ভাবে সকলে ভাই হইয়া যাইবে, মন পাপ ও অজ্ঞান শূন্য হইবে। মন নিষ্পাপ ও অজ্ঞান শূন্য হইলে আত্মার দুঃখ রহিবে কেমন করে? অজ্ঞান ও পাপ ভিন্ন আত্মার দুঃখ কি? দর্পণে বসি ময়লা না রহিল, তবে আর দর্পণের অনিষ্টকারক পদার্থ কি? সেইপ্রকার দর্পণ স্বরূপ

আত্মায় যদি মরলা না রহিল, তবে আর আত্মার হুঃখ কি ? তুমি এক বিন্দু জল, তুমি যদি আপনার সহিত অসংখ্য জীবনবিন্দু মিলাও, তবে কি তুমি মহৎ হইবে না ? অবশ্য হইবে । তাই বলি, যদি মহৎ হইতেও ইচ্ছা থাকে, তবে ভাতৃপ্রেম কর । মহত্বের সহিত শক্তির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, সুতরাং তুমি মহৎ হইলে অসীমশক্তিশালীও হইবে । শক্তি সূত্র, বাহার শক্তি আছে, তিনিই হুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবার অধিকারী । শক্তিশালী পুরুষকে কোন হুঃখই আক্রমণ করিতে পারে না । তাই বলি, যদি মহত্ব ও উৎসর্গে শক্তি-দেবী লাভ করিয়া সূখী হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ভাতৃপ্রেম ছাড়িও না । শক্তি-দেবীর মত আব কি কোন দেব-দেবী আছে ? বা শক্তির প্রকৃত পূজা না করিলে ও শক্তির কৃপা না থাকিলে কি কোন দেব দেবী ও মানবাদি জীব আদর পায় ? অথবা বাচিয়া থাকিতে পারে ?

এই ভারতে ভাই ভাই ভাব না থাকিতে প্রায় ২৪ কোটি মানব থাকিতেও ভারতে একটা মানবজাতীয় জীবনধণ্ডা নাই । হায় ! কবে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মত সকলকে আত্মবৎ দেখিয়া তাঁহাদের পুত্র বলিবা পরিচয় দিতে সক্ষম হইব ? যখন আমাদের তাঁহাদের মত বিশ্বপ্রেম নাই, তখন আমাদের সূত্র গৌরব প্রকৃতির কোন পদার্থ কি থাকিতে পারে ?

একণে আমাদের মধ্যে অনেকে যে ধর্ম বিশ্বাস করে, তাহাতে প্রেম নাই, যে ধর্মে প্রেম নাই, সে ধর্ম ধর্মই নয়, তাহা অধর্মের অপর নাম মাত্র ।

দেখিতে পাওয়া যায়, যখন কোন জাতির অধঃপতন আরম্ভ হয়, তখন সেই জাতির উন্নতিসময়ের উন্নততাববোধক শব্দগুলিতে মনস্তাব প্রবেশ করিয়া তাহা মনস্তাববোধক হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, প্রেম বা প্রীতি বলিলে আর্থেরা বেক্রপ বুঝিতেছেন, আমরা এখন আব সেক্রপ বুঝি না, সুতরাং আমরা প্রেম বিনা নিশ্চয় অধঃপাতে গিয়াছি। প্রেম বলিলে এখন আমাদের নরনারীর জঘন্ত মিলন ও তাব মনে পড়ে। স্বার্থপূর্ণ প্রণয়কে আমরা এখন প্রণয় মনে করি। তবজিগী সুল্লরী, তবজিগী আমাকে ভাল বাসিলে আমি সুখী হইব, এই আশা আমি তরজিগীকে ভালবাসি। তরজিগী যদি আমাকে না ভালবাসে, আমি তাহাব শত্রু হইবা দাঁড়াই। অধিক কি, তাহাকে ধ্বংস কবিতে ও আমি সম্মুচিত হই না। কামক্রিয়াকে প্রণয়ের উৎপত্তির মূল ভাবিয়া আমরা কামক্রিয়ায় মগ্ন হই, এবং কামের আদর্শ নাযক নাযিকা হজন করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিই। পবিত্র-আর্ধ্যহৃদয়নিঃসৃত সর্বোন্নতিবোধক প্রেমশব্দে এক্রপ জঘন্ত ভাব প্রবেশ করিতে দেখিয়া কোন্ সম্ভদয ব্যক্তি না কাঁদিয়া থাকিতে পারেন? আমরা যদি তাঁহাদের প্রকৃত সম্ভান হইতাম, তাহা হইলে বেকহেহে সময়তানেব আবির্ভাব এবং সময়তান কর্তৃক বেকহেহের দুর্গতি দেখিতাম না। সর্বধ্বংসী কামকে বেকহেহে চালনা করিহে ও পাপ বিষ্ঠা-মুক্তাদি মাথাইতে দেখিলে যে না ~~কঁদি~~ তাহাকে বহুবা বলিতে লজ্জা বোধ করে। তাই! আমি ~~কঁদি~~ নিকট এই মাত্র আশা করি, তাহার যেন কখনই এই পিণাচকে প্রেম না বলে।

আরও তাই ! ঐ নরনারীর দাম্পত্য-প্রেম-ভাব কামবির-
হিত হইলেও মল । আমি দেখিয়াছি, বাহারা দেশের উন্নতি
করিতে সক্ষম, একপাশে অনেক শিক্ষিত যুবক ঐ দাম্পত্যপ্রেমভাবে
অন্ধ হইয়া থাকিবার কাবণ তাঁহাদের জীবনসঙ্গী হইয়া রহি-
য়াছে । বলিতে কি, তাঁহারা যেন বিশ্বপ্রেমিকের কাছে ও নিব-
পেক জ্ঞানের কাছে জগতে থাকিয়াও যেন একটা নরকে পড়িয়া
রহিয়াছেন, জগতে থাকিয়াও জগৎকে দেখিতে পাইতেছেন না
ও জগতে বিচরণ করিতে পারিতেছেন না, ইহা কি দুঃখেব বিষয় ।
প্রেমের মূলধর্ম উপকাব । বে প্রেমে উপকার-ধর্ম নাই,
তাঁহাকে প্রেম বলিও না । সখ্য-দাম্পত্যাদি সকল প্রেমের মূল-
ধর্ম উপকাব অর্থাৎ পরকে সুখ দিয়া সুখী হওয়া ধর্ম কবিয়া
দিয়া প্রণয় নামে আখ্যাত কর, যদি না পাব, তাহার চিরপ্রচলিত
নীচাৰ্থবোধক শব্দে নাম দিও, কড়াচিৎ আৰ্য্যদের সর্বোন্নতি-
বোধক প্রেম-নাম দিও না ইতি । ১২১২ সাল । তারিখ
২ বৈশাখ ।

পুঃ আমার এই পত্র পড়িয়া তুমি হত মনে করিতে পার,
আমি একেবারে দাম্পত্য-প্রেমের বিরোধী । তোমার মত চিন্তা-
শীল জ্ঞানী ব্যক্তি যদি ইহা মনে করে, তাহা হইলে আমি অতি
দুঃখিত হইব, কারণ বাহারা সংসার হইতে সুখ তুলিতে চান,
তাঁহাদিগকে আমি মহাপাপী বলিয়া জ্ঞান করি । আমি জানি,
মানব সমুদ্রে এক সুখে থাকিতে পারে না ; কারণ কালক্রমে মন-
সুখে আর সুখ থাকে না । এই কারণে সংসারে যাবতীর সুখ
রাধা আবশ্যক । কেবল বিশ্বপ্রেম-জনিত সুখ সदा নূতন ; কারণ
বিশ্বপ্রেমিককে বিশ্বজনকে সুখ দিবার জন্ত নানা সুখ আদান

ও আবিষ্কার কবিত্তে হয় । জগৎকে বিবিধ সুখ দেওয়া বধন বিশ্বপ্রেমিকের ধর্ম, বধন জগতে যাবতীয় সুখ বিশ্বপ্রেম-সুখের অন্তর্গত, তখন সমস্ত সুখ রাখা বিশ্বপ্রেমিকের অত্যন্ত আবশ্যক । যিনি তাহা আবশ্যক মনে না করিয়া দাম্পত্যাদি সুখ জগৎ হইতে তুলিতে চান, তিনি বিশ্বপ্রেমিক নন, বরং মহাপাপী । আমি সকলকে বিশ্বপ্রেমিক হইয়া সকল সুখ আনন্দন করি-
বাব অন্ত এই পত্র লিখিয়া তোমাকে জানাইতেছি । বিশ্বপ্রেম আমাদের জীবন, বিশ্ব সুখ-চেষ্টার কার্যই আমাদের জীবনের কার্য, বিশ্বপ্রেম সুখ অনন্ত, সকল-সুখ-রক্ষক ও নূতন-নূতন-আবিষ্কারক । বিশ্বপ্রেমকে তুচ্ছ করিয়া কেবল দাম্পত্যাদি সুখে মগ্ন হওয়াবই আমি বিবোধী, কারণ ঐ সুখে শুদ্ধ মগ্ন হইয়া মানন মনুষ্যত্ব বিগর্জন দিয়া প্রত্যক্ষ নবকে ডুবিয়া থাকে । আমি দেবাদিদেব মহাদেবের স্তায়, হোমিওপ্যাথিক-ঔষ্ট্র হানিমান ও অনুষ্টুরাষ্ট্র গিল প্রভৃতির স্তায় বিশ্বপ্রেমিক হইতে অনুবোধ কবি । চৈতন্য, শঙ্কবাচার্য্য প্রভৃতি বিশ্বপ্রেমিককে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বপ্রেমিক বলিতে পারি না এবং ঐপ্রকার বিশ্বপ্রেমিক হইতেও অনুরোধ করি না । তাহারা দাম্পত্যাদি সুখ ছাড়িয়া জীবনকে অনেক পরিমাণে নীরস করিয়াছেন, কতক পরিমাণে বিশ্বভ্রাতৃত্বপ্রেম-সুখ তাহাদের জীবনে থাকিলেও তাহারা সাধারণের সম্পূর্ণ আদর্শ নন ।

যে মতে জগতে প্রকৃত অনিষ্ট হয়, ভ্রমক্রমেও তাহাকে জগ-
তের ইষ্ট জ্ঞান করিয়া যে বিশ্বপ্রেমিক ঐ ভ্রান্ত বিশ্বপ্রেমের
কার্য করেন, তাহার হৃদয়ে বিশ্বপ্রেম-অমিত প্রকৃত সুখ হয়
কি না ঐ বিষয়ে আমার দ্বিতীয় সন্দেহ আছে । সাবধান, তুমি

যদি প্রকৃত-বিশ্বপ্রেমিক হইতে চাও, প্রকৃত-বিশ্বপ্রেম-জনিত সুখ লাভ করিতে ইচ্ছা কর, বিশ্বের প্রকৃত সুখ অগ্রে পরীক্ষা করিয়া বিশ্বপ্রেম-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও, দেখিও যেন তোমার কার্য্যে জগতের অনিষ্ট না হয় । আমি পূর্বেই বলিয়াছি, দেবাদিদেব মহাদেবের জ্ঞান আমি বিশ্বপ্রেমিক হইতে অনুরোধ করি । দেবাদিদেব মহাদেবের পার্শ্বতীনায়ী গৃহিণী ছিলেন । দেবী পার্শ্বতী মহাদেবকে এবং মহাদেব পার্শ্বতীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন । তাহার অলঙ্কার প্রমাণ “দক্ষবজ্র” । তখাচ কে বলিতে পারে, অশিক্ষিত স্ত্রীপ্রাণ যুবকের জ্ঞান শিব স্ত্রী-উপাসক স্ত্রী ? কে বলিতে পারে মহাদেব বিশ্বপ্রেমিক নন ? চিন্তাশীলদের চক্ষে মহাদেব মানবকুলের অকাল-মৃত্যু-নিবারণের জন্য সত্যতঃ ঋশানে ঋশানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, শব্দে কি কি আছে দেখিবার জন্য মৃতদেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতেছেন, কখন বা পর্কতে পর্কতে বনে বনে বেড়াইয়া কোন বস্তুর কি গুণ, কোন উদ্ভিদ বা ধাতু দ্বারা মানবের কি উপকার হইতে পারে, কি রোগ নিবারণ হইতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, কখন বা অকালমৃত্যুর ও আত্মহত্যার উপায় আবিষ্কারের জন্য চক্ষু মূর্ত্তিত করিয়া চিন্তা করিতেছেন এবং বহু চিন্তার পর যোগাঙ্গী শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেছেন, জীবকে সুখ দিবাব জন্য কখন বা সঙ্গীতশাস্ত্র প্রণয়ন করিতেছেন, কখন কা কার্য্য দ্বারা মানবকে আপনার সহধর্ম্মিণীর জ্ঞান নারীর সহ দাম্পত্য-সুখ লাভ করিতে উপদেশ দিতেছেন । ঐপ্রকার বহু বিশ্বপ্রেম-কার্য্যে শিবের দাম্পত্য-প্রেম ডুবিয়া গিয়াছে । স্ত্রী আছে কিন্তু তিনি স্ত্রী নন, প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক, পরোপকারের

জন্ম বিব পর্য্যন্ত বাইতে ভীত নন, পরোপকারের জন্ম বিব ধাই-
লেন, কিন্তু সহধর্মিণী নিবারণ করিলেন না, বরং সন্তুষ্ট হইলেন ।
শিবের ঐ সমস্ত গুণ দেখিয়া তিনি (পার্শ্বতী) মহাদেবকে
বিবাহ করিয়াছিলেন, তবে তিনি বিমর্ষা হইবেন কেন ? দেবা-
দিশ্বৈক মহাদেবের গুণ দেখিয়া আমি সকলকে ঐপ্রকার বিশ্ব-
প্রেমিক হইতে অনুবোধ করি, এবং সর্বপূজ্য ভগবতী-দেবীর
গুণ দেখিয়া আমি ঐপ্রকার বিশ্বপ্রেমিকা স্বীয় সহিত বিশ্ব-
প্রেমিককে ও বিশ্বপ্রেমিকাকে ঐপ্রকার বিশ্বপ্রেমিক পুরুষের
সহিত দাম্পত্যপ্রেম-সুখ লাভ করিতে অনুবোধ করি । শিব ও
ভগবতী দাম্পত্য-সুখ লাভ করিতেন বটে, কিন্তু ঐবৃত্তিজনিত
কার্য্যকে তাঁহারা জীবনের কার্য্য বলিয়া ভাবিতেন না । এই
কাবণে তাঁহারা ঐ সুখ লাভ করিয়া প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক বা বিশ্ব-
প্রেমিকা ।

সকলের সকল বৃত্তিই কম বা বেশী পরিমাণে আছে, কিন্তু
ধাঁহার যে বৃত্তি প্রবল, তাঁহাকে লোকে সেই বৃত্তির লোক
বলিয়া থাকে । এই কারণে মহাদেব বিশ্বপ্রেমিক ও তৎসহ-
যোগিনী ভগবতী বিশ্বপ্রেমিকা । কারণ তাঁহাদের বিশ্বপ্রেম-
বৃত্তি প্রবল ছিল । দাম্পত্যাদি অন্তান্ত বৃত্তি তাঁহাদের ছিল বটে,
কিন্তু তাহা এত ক্ষীণ যে অতি কষ্টেও দেখিতে পাওয়া যায় না ।

যে কারণে দেবাদিদেব মহাদেব ও দেবী ভগবতী দাম্পত্যাদি
প্রেমাপাদন করিয়াও বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিকা হইয়াছেন,
সেই কারণে জন্মষ্টার্ট মিল টেলর পত্নী সহ ও টেলর-পত্নী
মিলের সহ, এবং অন্তান্ত ব্যক্তি দাম্পত্য সুখাপাদন করিয়াও
বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিকা হইয়াছেন । আমি এইপ্রকার সকল

লোককে বিশ্বপ্রেমিক হইয়া বিশ্বপ্রেমিকা স্ত্রীর সহিত ও বিশ্ব-
প্রেমিকা বিশ্বপ্রেমিকের সহ দাম্পত্যপ্রেম-স্থখ লাভ করিতে
অমুবোধ কবি ইতি ।

ডোয়ার

শ্রীপ্রমদাচরণ সেন



স্বাধীনচিন্তাবিষয়ক দ্বিতীয় পত্র ।

তাই প্রমদাচরণ । তোমার প্রেমবিষয়ক পত্র সাদবে গ্রহণ ও নিবিষ্টমনে পাঠ কবিয়া জানিয়াছি, তুমি আমাকে যে বিষয়ে পত্র লিখিয়াছ, সে বিষয়ে তুমি স্বয়ং ভুক্তভোগী ।

আমি তোমাকে আমি দেশের আর একটা অবস্থা জানাইব । তুমি এই অবস্থা জানিয়া অত্যন্ত আত্মাধিত হইবে জানিয়া নিম্নলিখিত ঘটনা জানাইতে প্রবৃত্ত হইলাম । আমি জানি, তুমি পাশ্চাত্যশিক্ষার পক্ষপাতী । পাশ্চাত্যশিক্ষা আমাকে স্বাধীনতা প্রদান করে এবং ভাল মন্দ দেখিবার ও গ্রহণ করিবার শক্তি দান করে । এমন কি, ইষোবোপ ইহার জননী হইলেও ইহা মাতেরও প্রকৃত দোষসমূহ দেখিতে পায এবং ঐ সমস্ত দোষকে হুণী করে ও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না । ইত্যাদি যাবতীয় গুণ উহাতে দেখিযা তুমি পাশ্চাত্যশিক্ষা ভালবাস । বাহা জীবনের হিতকারী তাহাই জীবনের বন্ধু বা জীবন বলিলে অভ্যুক্তি হয় না । অতএব পাশ্চাত্যশিক্ষা অল্প দেশে অন্য গ্রহণ করিয়াছে বলিযা তুমি অল্প ভাব না এবং তাহাকে ভাবভের বন্ধু বা জীবন বলিয়া বিবেচনা কর । তুমি এক দিন বলিযাছিলে, “ইহার দ্বিতীয় জন্ম ইয়োরোপে হইয়াছে বটে, কিন্তু আদি জন্ম ভারতের বিজ্ঞান ও দর্শনরূপে ।” তুমি আরও বলিযাছিলে, “ঐ শিক্ষা সমস্ত মানবজীবনে সত্যত অপ্রকাশ রহিয়াছে । যিনি

এচলিত শিক্ষাভাবে কোন কারণে স্বাধীন হইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিছেন, তিনি ইয়োরোপীয় ভাষা না জানিলেও পাশ্চাত্য-শিক্ষার মতগুলি তাঁহার জীবনে উদ্ভিত হইবে। ইহার প্রমাণ মহাত্মা স্বরানন্দ সরস্বতী। পাশ্চাত্যশিক্ষার বীজ সকলের জীবনের সহিত জগতে আসে বটে, কিন্তু আত্মবিকাশ-বিরুদ্ধশিক্ষায় তাহা রুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই কাবণে ভাবতে ইয়োবোপীয়শিক্ষা ব্যতিরেকে ভারতেব মানবজীবন অধিকাংশ স্বয়ং পাশ্চাত্য-শিক্ষার কল লাভ করিতে পারিতেছে না। এই সমস্ত কারণ দেখিয়া আমি বিবেচনা কবি, তুমি পাশ্চাত্যশিক্ষা-বিস্তারের কথা শুনিয়া অতি আত্মদ্রোহিত হইবে। এক্ষণে তোমাব আত্মদ্রোহের কারণ বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আজি করেকদিন হইয়া গেল, আমি আমার কোন পল্লী-গ্রামের বন্ধুর বাটীতে বাইবাব অভিপ্রায়ে সহব ছাড়িয়া পূর্বাঞ্চলে গিয়াছিলাম। একদিন অপরাহ্নে আমি একটা পুষ্কর ময়দানমধ্যস্থ রাস্তা দিয়া হাঁটিতেছি, এমন সময়ে আকাশের পশ্চিম দিক হইতে মবনীল জলধর মহাডম্বব করিয়া আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে বড় বহিতে লাগিল ও তৎসঙ্গে মেঘে আকাশ ছাইয়া কেলিল। হ হ করিয়া বৃষ্টি আসিতে দেখিয়া আমি ময়দানের দক্ষিণদিকস্থিত পল্লীর পানে দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম এবং 'একটা নারিকেল-বৃক্ষ-বেষ্টিত গৃহে' বাইয়া আশ্রয় লইলাম। বাটীটা দক্ষিণদ্বারী। বাটীর সম্মুখে একটা সুন্দর চতুর্মুখপ রহিয়াছে। আমি তাহাতে আশ্রয় লইলাম এবং দেখিলাম, বাটীতে একটা পঞ্চবিংশতিবর্ষবয়স্ক সুন্দরী, একটা অর্ধবয়স্ক দাসী, আর একটা ভোজপুত্রী দ্বারপাল রহিয়াছে।

গৃহস্থামিনী আমাকে সিন্ধুবসন দেখিয়া পরিধান করিতে শুধু একখানি কাপড় দিলেন এবং আমাকে তামাক দিবার নিমিত্ত দাসীকে হুকুম করিলেন । আমি ডান্ডকুট-দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত, এই সময়ে কতকগুলি সন্ন্যাসী মোহান্তসহ আসিয়া চণ্ডী-মণ্ডপে আশ্রয় লইল । তাহাদের মাথায় তালপত্রের ছাতা ছিল ; বোধ হয়, এই কারণে তাহাদের বস্ত্র আজ' হয় নাই । তাহারা নম্র কন্মল, ব্যস্ত ও হরিণের চৰ্ম্ম বিছাইল এবং তত্পরি বসিয়া গঙ্গিকা সেবন করিতে করিতে গৃহস্থামিনীকে মরদা যুত প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য বারংবার বাচণ্ডা করিতে লাগিল । গৃহস্থামিনী বিনম্রভাবে বলিলেন, “অদ্য যিনি এ দরিদ্রার ঘরে আশ্রয় লইবেন, তাঁহাকেই আমার সাধ্যমত সেবা করা উচিত ; কারণ বাহারা আজি বিপদে পড়িয়া গৃহে আশ্রয় লইবেন, তাঁহারা লোভের বশীভূত হইয়া লইবেন না । কিন্তু আপনারা বা আপনাদের ভ্রাতৃ কেহ ইচ্ছাপূৰ্ব্বক আশ্রয় লইলে, আমি আপনাদিগকে বা আপনাদের মত লোকদিগকে দান বা আহার দিতে স্বীকার করিতাম না ।”

গৃহস্থামিনীর এই কথায় বোধ হইল, তিনি যেন মানব-হিতৈষিনী সূতৰ্কপ্রিয়া, যেন জ্ঞানালোচনা করিবার ও সন্ন্যাসী-দিগকে জ্ঞান দিবার জন্তই সন্ন্যাসীদের সহিত তর্ক করিতে আগ্রহসর হইলেন ।

মোহান্ত । কেন ?

গৃহস্থামিনী । প্রভো ! শুশ্রূষ, মানবের মনে কতকগুলি কুশক্তি আছে । সেই কুশক্তিগুলি দ্বারা তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হইয়া মন ও তৎসঙ্গে শরীর পোষণ করিতে পারে ।

সেই সমস্ত শূন্যতার বিকাশের হেতু স্বাধীনতা। সেই সমস্ত শূন্যতার অধিকাংশ বা অল্প স্বতন্ত্র মানবের মনে বিকাশ পায়, ততদিন মানবের জীবনের অস্তিত্বের পরিচয় দেয়। অজ্ঞান বা অজ্ঞানোচ্ছৃঙ্খল-কুশক্তিগুলির কুশক্তি সেই সমস্ত শূন্যতা অপেক্ষা প্রবল হইলে সেই সমস্ত শূন্যতা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। যেহেতু কুশক্তি বিকাশ হওয়ায় প্রধান কারণ পরমুখাপেক্ষী হওয়া। আপনারা পাণের ভয়ে বৈরাগ্যধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু উদরের জ্বালায় পরমুখাপেক্ষী হওয়াতে লোভ প্রভৃতি কুশক্তি সকল প্রবল হইয়া আপনাদের শূন্যতাগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। যে কারণে—

মোহান্ত আর গৃহস্থামিনীকে কথা বলিতে না দিয়া যেন উদীয় জ্ঞানের পরিচয়ের জন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! কুশক্তি-গুলি কি আত্মার পদার্থ নয়?

গৃহস্থামিনী। অগতঃ স্বাভাবিক পদার্থ আলোচনা করিয়া যেখন, কোন পদার্থেই আপনার অনিষ্টকর বস্তু দেখিতে পাইবেন না; দেখিতে পাইবেন, সকল পদার্থই আপন আপন জীবন-নির্ব্বাহের পদার্থকর বা বেশী নহীয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। স্বতন্ত্র জীবন-নির্ব্বাহের পদার্থকর না পার, ততক্ষণ কেহ জন্মগ্রহণ করে না। যেখন, গাছ হরিয়া বাইতেছে। গাছের অনিষ্টকর পোকা বা অন্য কোন অনিষ্টকর পদার্থ গাছের অনিষ্ট করিতেছে। গাছের ধর্ম (জীবনাংশ) গাছের অনিষ্ট সাধন করিতেছে না, অর্থাৎ গাছ গাছের আপনার আপনি অনিষ্ট সাধন করিতেছে না; তরুজীবনের ক্ষেত্রেই তরুর অনিষ্ট সাধন করিতেছে। প্রভেদ! আমি এই সংসারে ছুইটি মূল পদার্থ

দেখিতে পাই, একটি জীবন, আর একটি মৃত্যু। জীবন-মৃত্যুর বিরুদ্ধ-গুণাবলম্বী বিরুদ্ধ পদার্থ, এবং মৃত্যু, জীবনের বিরুদ্ধ-গুণাবলম্বী বিরুদ্ধ পদার্থ। সংসারে এই দুই পদার্থ অহোরাত্র যুদ্ধ করিতেছে। মৃত্যুর কুশক্তিরূপ অংশ সকল জীবনকে নাশ করিবার জন্য যুঝিতেছে যুঝিতেছে ও সময়ে সময়ে কার্যসিদ্ধও করিতেছে। জীবনের সুশক্তিরূপ অংশ সকল মৃত্যুর মৃত্যু ও আত্মবল্লী করিবার জন্য যুঝিতেছে, যুঝিতেছে ও সময়ে সময়ে কার্যসিদ্ধও করিতেছে। তবে কি কবিয়া মৃত্যুর কুশক্তি সকল জীবনের পদার্থ হইবে? আরও শুধুন, উহারা পরস্পর পবনবলের মৃত্যু এবং দবং দয়ং জীবন, অর্থাৎ একের কাছে বিপদীতটি মৃত্যু, আপনি জীবন, এবং ঐ মৃত্যু পুনর্বার আপনি জীবন ও পরটি মৃত্যু। জগতের সমস্ত বস্তুর জীবন ও মৃত্যু আছে। যে বিব মানব-জীবনের মৃত্যু, সেই বিব-জীবনের আবার মৃত্যু-পদার্থ আছে। জীবনের নিষম এই, গুণ বা শক্তিসমূহ বিকাশ করিয়া আত্মরক্ষা ও আপনাকে সুখী করা। মৃত্যুর নিয়ম এই, জীবনকে গ্রাস করা। যে পদার্থের জীবনের বাহা গুণ বা শক্তি তাহা উর্দ্ধ-গামী। ঐ গুণকে যে ঢাকা দেয় বা নাশ করে, তাহা জীবনের বিরুদ্ধ মৃত্যু-পদার্থ। যদি কুশক্তি-আত্মপদার্থ হইত, তাহা হইলে তাহা জীবনকে উর্দ্ধগামী করিত, নাশ করিত না, অথবা জীবনকে অক্ষয় করিত না। সুতরাং মানব জীবনের কুশক্তি-সমূহ মানব-জীবনের মৃত্যু। মানব-জীবনের মৃত্যু কি মানব-জীবনের আত্মপদার্থ হইতে পারে? এবং মৃত্যু ও জীবন কি একযোগ হইতে পারে?

মোহান্ত । দেবি ! আপনার কথাতে এই বুঝিলাম, জীবন একটি পদার্থ, আর তৎবিরুদ্ধ-গুণাবলম্বী মৃত্যু একটি পদার্থ।

উহারা পরস্পর পরস্পরের শত্রু ও মৃত্যু । মৃত্যুর লক্ষণ এই যে, জীবনধর্মকে গ্রাস ও জীবনকে ধ্বংস করা, হুতরাং জীবনকে ধ্বংস করিবার জন্য নিজ শক্তিগুলি দ্বারা অধোগামী করা; অধোগামী না করিলে মারিতে পারা যায় না । জীবনের লক্ষণ এই যে, যোগ্যবলীকে উর্দ্ধাশ্রিত করিয়া আপনাকে রক্ষা ও আপনাকে বিবিধস্থানে আলোকিত করা । কুণ্ডল যখন আমাদের মনকে অন্ধকার, অধোগামী, শরীর ও প্রাণ ধ্বংস করে বা শুণ সকল ঢাকা দেয়, তখন কুশক্তি-সমূহ আমাদের মৃত্যু । পরের নিকট আশা কবিবা-মাত্র আপনার কুশক্তি-সমূহ অদৃশ্য হইয়া যায়, হুতরাং আমরা বাচিয়া থাকিতেও মরিয়া গিয়াছি । আমরা মরিয়া গিয়াছি সত্য, কিন্তু আপনি আমাদের মত অতিথিদিগকে আহার দিবার নিমিত্ত আপনার মনে দয়া প্রভৃতি স্রবুত্তি সকল বিকাশ হইয়া আপনারও জীবন থাকে ? হুতরাং আপনার সুখও থাকিবে ? আপনি যখন মনোনিচকারিপদার্থকে মৃত্যু-বৃত্ত বলিয়াছেন, তখন তাহাকে অবশ্য জীবনের হুঃখ এবং শুণ বা কুশক্তিগুলিকে জীবনের সুখ সুখে না বলিলেও ঐ কথার প্রকাশ করিয়াছেন । জীবনের শুণ বাহা তাহা প্রায় পরের ইষ্ট করাই । পরের ইষ্ট করাই যখন আপনার জীবন, হুতরাং সুখ এবং শুণ বলিয়া নির্দেশ করেন, তখন অতিথিদিগকে তাড়াইয়া দিবেন কেন ?

গৃহস্থামিনী । আপনি সত্যই বুঝিয়াছেন, জীবনের বাহা শুণ, হুতরাং জ্ঞানের মুতে বাহা সুখ বা জীবনাংশ, হুতরাং জীবন তাহা অন্য জীবনকে সুখ দিবার চেষ্টা বা সুখ দেওয়া । অন্তর-অগতের নিয়ম এই যে, 'পরকে সুখ দিবার চেষ্টা করিলে

জীবনের সমস্ত গুণ, সুতরাং (জ্ঞানের আদেশমতে) সমস্ত সুখ, বা সমস্ত জীবন বিকাশ হইয়া জীবন একান্ত সুখী হয়। এবং আপনাকে প্রকৃত সুখ দিবার চেষ্টা কবিলে অন্ত্যস্ত জীবনকে সুখ দিবার চেষ্টা ও চেষ্টার ফল সুখ দিতে হয়।”

জ্ঞানের আদেশে অন্ত্যস্ত জীবনের সুখচেষ্টা বা সুখ দেও-
যাকে আমি জীবন, গুণ বা সুখ দীকার ববিশ্যাম, কিন্তু আপনা-
দিককে আহাব দিলে বা দান কবিলে আপনাদেব আত্মার যে
অবনতি হইবে ? আমি যখন আপনাদেব উপকার দেখিতে পাই-
তেছি না, তখন আমার জীবনের স্নানব বৃত্তিসমূহ বিকাশ হইবে
কি প্রকারে ? সুতরাং সুখও বা হইবে কি প্রকারে ? অন্ত্যস্ত
জীবনকে সুখ দিয়া বা সুখ দেওয়ার চেষ্টায় অথবা তাহারের
সুখ দেখিয়া যখন আমাদের জীবন শুধু লাভ করে, তখন
আপনাদের জীবনের অধোগতি, সুতরাং সুখ দেখিয়া আমরা
হুঃখ বৈ সুখ হইবে কি প্রকারে ? অন্ত্যস্ত জীবনকে সুখ দিবার
চেষ্টা বা সুখ দেওয়া যখন আত্মার সুখ হয়, তখন অন্ত্যস্ত
জীবনের প্রকৃত সুখ যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা করা বা দেওয়া
স্বাভাব্যের নিয়ম। অন্ত্যস্ত জীবনকে হুঃখ দিবার চেষ্টা বা
দেওয়াকে ভ্রমবশতঃ সুখ দেওয়ার চেষ্টা কবিলাম বা সুখ দিলাম
তাবিধা সুখী হওয়া স্বাভাব্যের নিয়ম-বিস্তৃত কার্য।

মোহান্ত । দেবি । পবিত্রতা-পক্ষাবলম্বীদের মুখে শুনি-
রাছি, “অতিথি ভাল কি মন্দ বিবেচনা করা উচিত নয় ; যেকোন
অতিথি আসুক না কেন তাহাকে দান করিলে বা আহার করা-
ইলে মনের পবিত্রতা রক্ষা পায়, অতিথিকে মন্দ জানিয়া
প্রদানইয়া দিলে নির্ভরশক্তি মনকে হেবিতা ফেলে।”

গৃহস্থামিনী। পূর্বেই এই কারণ নির্দেশ করিয়াছি যে, পাতার কেন পবিত্রতা থাকে ? ঘাড়া মনে করে যে, আমি ঘাচককে সুখ দিলাম। যদি তাহার মনে উদ্ভিত হইত, আমার অর্থ বা আহার দ্বারা ঘাচকের অপকার করিলাম, তাহা হইলে, তাহার মনে দান-অনিত পবিত্র সুখ থাকিত না। যখন অজ্ঞাত স্রীবনকে সুখ দেওয়ার চেষ্টা ও দেওয়াই পবিত্রতা, সুতরাং জীবনের সুখ (কারণ পবিত্রতার অপর নাম সুখ), তখন অজ্ঞাত-দেহের প্রাণের প্রকৃত সুখ বাহ্যতে হয় তাহা করাই দয়ার নিয়ম। নিয়মবিরুদ্ধ কার্য করাই মহাপাপ। ঘাহারা পবিত্রতার গন্ধপাতী হইয়া অস্তের অপকার হইতে বেধিয়াও পূর্বজাত-মতের দ্বারা বশতঃ অপকারকে উপকার তাবেন, আমি হৃৎকণ্ঠে বলিতেছি, তাঁহাদের জীবন অন্ধকূপে পড়িয়া থাকে। যখন তাঁহাদের জীবন অন্ধকূপে আব্রহ্ম করিয়া থাকে, তখন যে তাঁহাদের জীবনে কখনই প্রকৃত পবিত্রতার উদয় হইতে পারে না, ত্রুটি সাহস করিয়া বলিতে পারি। এতো। জীবনে অজ্ঞান-মরণা থাকিতে কি প্রকারে প্রকৃত পবিত্রতার উদয় হইবে ?

আগনি পবিত্রতা-গন্ধাবলম্বী হইয়া বলিয়াছেন, অতিথিকে মশ জালিয়া তাড়াইয়া দিলে নিষ্ঠুরবৃত্তি মনকে অধিকার করে। তদ্বৎসরে শুশ্রূণ, পরোপকার-বৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া নিষ্ঠুর-বৃত্তিকে আনয়ন করিলেও, স্পর্শ-সর্পি-সংযোগে লৌহ যেমন বর্ষ হইয়া যায়, তদ্রূপ নিষ্ঠুরবৃত্তিও পরোপকার-বৃত্তি-সংযোগে সূক্ষ্ম ও নীড়ল হইয়া যায়।

এতো। অর্থ-দান অথবা ভিক্ষা-পদার্থাদি-দান দয়াবৃত্তির

কার্য। প্রেম প্রেম, জ্ঞান তাঁহার চক্ষু এবং দয়া সাহস প্রভৃতি বৃত্তিগুলি প্রেমের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। প্রেমের স্বধন জ্ঞান চক্ষু তখন তিনি অসং হইবেন কি প্রকারে? দয়া সতের অঙ্গ, সুতরাং দয়াও সং; সতের কার্য সং বৈ অসং হইবে কেন? জ্ঞান দয়ার প্রধান অঙ্গ, সুতরাং জ্ঞান দয়াকে চালনা করিবার একমাত্র অধিকারী। আপনার অন্তকে কে ভিন্ন ভাব ভাবে? বা আমি বড়, অমুক ছোট, অমুক ছোট, আমি বড়, এই বিষয় লইয়া গোলমাল করে? বড় হউক, বা ছোট হউক, সর্বাত্মকে স্বধন আমি ভিন্ন অঙ্গ কোন ভাব ভাবিবার নিয়ম নাই, তখন দয়া জ্ঞানকে অপর, বা জ্ঞান দয়াকে অপর কেন ভাবিবে? জ্ঞান আমি জ্ঞানে দয়ার পবিচালক ও দয়া আমি জ্ঞানে চালিত হয়। তবে অজ্ঞান জ্ঞান সাজিয়া দয়াকে চালাইবার কে? অজ্ঞান বধু দয়ার কেহ নহ, তখন দয়া অজ্ঞানের হুকুমে চলিবে কেন? অজ্ঞান কি দয়া উৎপন্ন করে? বা দয়া কি অজ্ঞানের কোন অঙ্গ? বাহাতে বাহার অধিকার নাই, তাহা সে আপনার বেশে অধিকার করিতে পারে না। পররূপ ধরিয়া সে যদি একুত অধিকারীর অধিকার গ্রহণ করে, তাহা হইলে, সে চোরের কি দণ্ড নাই? তাহার দণ্ড তাহাকে বাড়ে ধরিয়া একুত অধিকারীর অধিকার হইতে বিহার দেওয়া। ঐ অজ্ঞান-চালক দয়া কি স্বার্থ দয়া থাকে? সে কি দয়ার একুত কার্য করিতে পারে? *

জ্ঞান-চক্ষু প্রেম, দয়া সাহস ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে কার্যনির্বাহের জন্য নিযুক্ত করেন ও পুনর্বার কার্যোদ্ধারের জন্য জ্ঞানও প্রসব করেন; প্রসব করেন বলিয়াই কেন? প্রথমে জ্ঞান প্রেম আনয়ন করিলেও প্রেম পুনর্বার জ্ঞান

আনবন করেন। মনে করুন, জ্ঞান আপনাকে ডাই বলিখ। আমাকে জানাইল ; জানাইবার কাবণে আপনাকে আমি প্রেম কবিলাম, সুতরাং জ্ঞান হইতে প্রেমাংগন হইল। প্রেমের কল্যাণে আপনি ও আমি একাত্মা হইয়াছি, এমন সময় আপনার কোন বিপদ হইল, আমি এখন প্রেম, আমি আপনার বিপদ উদ্ধারের জন্য জ্ঞান আনাইবাব চেঁটা কবিলাম, ও শেষে চেঁটার কৃতকার্য হইয়া আপনাকে উদ্ধার কবিলাম। এইখানে দেখুন, প্রেম হইতে পুনর্বার জ্ঞান উৎপন্ন হইল কি না ?

তিনিয়াছি, মহাত্মা হানিমানের এক বন্ধু ছিল। ঐ বন্ধুর কঠিন রোগ হইল। তিনি এলোপ্যাথিক প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিং কোন ক্রমে রোগীকে আরোগ্য করিতে পারিলেন না। এই কাবণে তৎকালীন সমস্ত প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর হানিমানের অবিশ্বাস হইল। বাহাতে লোকের অকালমৃত্যু না ঘটে, তিনি তঁহার চেঁটা করিতে লাগিলেন। সেই ভূয়সী চেঁটার ফলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের আবিষ্কার হইল। এইখানেও দেখুন, প্রেম-বৃত্তিনামক হানিমান হইতে জানোংগন হইল কি না ? জ্ঞান প্রেম দ্বারা ইত্যাদি দ্বারা একত্বপূর্ণ সৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞান কখন মস্তিষ্ক এবং প্রেম কখন মস্তিষ্ক হইয়া অন্তান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-বিশ্বকে চালনা করেন। উঁহারা যখন এক, তখন তাঁহাদিগকে বলপূর্বক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া মহাপাপ, এবং উঁহাদের এক এক অঙ্গের প্রশংসা বা নিন্দা করাও মহাপাপ, সমস্ত অঙ্গটী আমাদের পূজনীয়। কার্যনির্বাহেব জন্য কেহ মস্তিষ্ক, কেহ জ্ঞান, কেহ চক্ষু, কেহ হস্ত, কেহ পদ ইত্যাদি হইয়াছেন।

কার্যনির্বাহের জন্য কোন ব্যক্তি হস্ত পদাদি হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার কি নিন্দা করা উচিত? কোন্ ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তি সংসারের কার্যনির্বাহের জন্য ভগবানের শ্রুতযুক্তির নিন্দা করেন? তবে কেন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও জ্ঞানী ব্যক্তি প্রত্যক্ষ প্রেমের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাল মন্দ বিচার করেন? ও কার্যনির্বাহের জন্য নীচাত্মকে নিন্দা করেন? যদি হস্তপদাদি না থাকিত তাহা হইলে চক্ষু হৃদয় প্রভৃতি উত্তমাত্মের কি দর্শ্য হইত? এই জন্য আমি প্রেমের অঙ্গ সকলকে সমান ভাবিতা ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি ও এখন করিতেছি।

মোহান্ত। জ্ঞান বধন প্রেম আনন্দন করেন ও প্রেম বধন দয়া ও জ্ঞান আনন্দন করেন, দয়া বধন সাহস প্রভৃতি বৃত্তি ও পুনর্বার প্রেম আনন্দন করেন, তখন কোন সম্প্রদায় কি করিয়া কহেন “ভ্রায বা নীতিজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ এই যে, মানব বধন অজিজ্ঞতা দ্বারা জানিতে পারিল, আমি যদি দার্শনিকের জন্য অমুকের অনিষ্ট করি, তবে অমুক আমার অনিষ্ট করিবে। এই কারণে তাহারা খীর খীর বৃত্তি এক্রপ ভাবে চালনা করিতে লাগিল যে, বাহাতে অস্ত্রের অনিষ্ট না হয়। এইখান হইতে ভ্রায বা নীতির উৎপত্তি হইল, এবং পরানিষ্ট করাকে মহাপাপ বলিয়া ঘোষিত হইল।”

দেবি! আপনার কাছে জ্ঞান পাইয়া ভ্রায বা নীতির উদয় সম্বন্ধে আমি তাঁহাদের উক্ত মত অবীকার করিয়া বলিতেছি যে, “মানব বধন দেখিতে পাইলেন বা অশ্রুতি দেখিয়া অমুভব করিলেন, আমরা সকলে এক, তখন তাঁহাদের মধ্যে প্রেম জন্মিল। সেই অবধি পরের ইষ্ট করাকে

তাহারা ছায় বা নীতি অথবা পুণ্য এবং অনিষ্ট করাকে পাপ বা কুনীতি, অথবা অম্ভায় বলিয়া ঘোষণা করিলেন । সেই অবধি ছায় বা নীতি অথবা পুণ্যের সংস্কার উদয় হইল ।

দেখুন, মানবের আদিম অবস্থা অথবা শিশু অবস্থা সরলতা-ময়ী । যখন মানব শিশু থাকেন তখন তাঁহারা সম্পূর্ণ সরল ; সরলতার সময় মহানুভূতি বাজ্য করে , সুতরাং মানবের আদিম কালে বা শিশু অবস্থায় তাহারা যে পরের ইষ্ট কবাকে ছায় বা নীতি অথবা পুণ্য বলিবেন এবং অনিষ্ট কবাকে পাপ, কুনীতি অথবা অম্ভায় জানিয়া ঘোষণা করিবেন ইহা হিব । স্বার্থোৎপন্ন-নীতি-বাদীদের মতাপেক্ষা এই মত অধিক যুক্তিসঙ্গত । আমার জ্ঞানে এই মতই সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ, সুতরাং সম্পূর্ণ সত্য ।

মহাত্মা বাইবেলবচনিতাও আদম ও ইভের উপাধ্যানে দেখাইরাছেন যে “মানবের আদিম অবস্থা সরলতাময়ী, পরে সরলতান (অজ্ঞান) স্বীকৃত পাপপুণ্যকে আনিয়া মানবের সবলতাময় মনোরাজ্যে আশ্রয় দান কবে ।” আশ্রয়ও ঐকপ মত । মানবের শৈশবাবস্থা হইতে বার্জিক্য পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার ঐ মত দৃঢ় হইরাছে । কারণ শিশুগণকে আমি পাপশূন্য ও সবল দেখি তাহাদের মহানুভূতি ও তৎপ্রসূত-অনুকরণবৃত্তিকে বলবতী দেখি এবং তৎপরে আজ্ঞান ও অজ্ঞান পাপীদের পাপবৃত্তি হইতে তাহাদিগকে পাপী হইতে দেখি , সুতরাং বাইবেলের ঐ মতকে সত্য বলিয়া কেন না বিশ্বাস করিব ?

প্রত্যক্ষ করিয়া অনেক ভাবের উল্লেখ কর । এই কথার অর্থোৎকৃষ্ট বলি, যেমন শ্রমকে আপনায় মত দেখিয়া রামের

প্রেমভাবের উৎপত্তি হয় । যদি রাম ভ্রমবশতঃ শ্রামকে অন্তের মত দেখে, তবে তাহার অপর ভাবের উদয় হইবে । প্রকৃতিকে সুন্দরী দেখিলে মনে সুন্দর ভাব আসিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি ।

যেমন ভাব দেখা যায়, ভাবপূর্ণ মন ঠিক থাকিলে তাহাতে সেইরূপ ভাবের উদয় হয় । যখন অন্তকে আপন দেখিলে মনে প্রেমভাব ও নীতি ইষ্টানিষ্ট প্রভৃতি প্রেমের আনুসঙ্গিকভাব উদয় হয়, তখন নীতি বা ভায় প্রভৃতি পুণ্যভাব মানবের মানসিক স্বতঃসিদ্ধ ভাব না হইবে কেন ? উহা যে সুবিধার জন্ত হইয়াছে এ কথা স্বার্থোৎপন্ননীতিবাদীরা কি করিয়া বলেন ? যখন অমুক দেখিলে অমুক ভাবের উদয় হয়, তখন প্রেমনীতি প্রভৃতি সত্যবৃত্তি পংকের নিকট শিক্ষণীয় বা স্বার্থসাধন-কুসৃত্তি-জাত একথা কি করিয়া বলিব ?

● মানব ইহলোক ব্যতীত আর কিছু জানে না, কিন্তু গল্প-লোক, ঈশ্বর ও নরকের ভয়ভাব যদি তাহার মনে উপস্থিত হয়, অথবা নারীকে সুন্দরী দেখিয়াও তাহার মনে সুন্দর ভাব উদ্ভিত না হইয়া যদি ভৎপন্নবর্ত্তে কুভাবের উদ্ভেদ হয়, তাহা হইলে, তাহাকে শব্দজ্ঞানভাব অর্থাৎ পরের নিকট শিক্ষণীয় ভাব বলিতে পারি । যে বস্তু দেখিলে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার বিরুদ্ধ ভাব উদ্ভিত হইতে দেখিলে কৃত্রিম ভাব অর্থাৎ কুশিক্ষণীয় ভাব বলিতে পারা যায়, নতুবা বলিতে পারা যায় না ; সুতরাং আত্মবৎ-দর্শন-জনিত নীতিভাবকে কৃত্রিম বলিতে পারা যায় না ।

পুনশ্চ আমাদের স্বার্থসাধনবৃত্তি সকল সুরূপীহীন । দেখুন, এই সত্যসময়েও কান্ন ক্রোধ হিংসা লোভ প্রভৃতি স্বার্থসাধন-

বুদ্ধি সকলের কি দূরদৃষ্টি আছে ? কান ক্রোধ প্রভৃতিতে অন্ধ হইয়া পাপ, রাবণ, হর্ষোদন, মীরজাফর ওরঙ্গীব প্রভৃতি কতই মরিল, তবে ইহাদিগকে কি করিয়া দূরদৃষ্টিমান বলিব ? বাহারা স্বয়ং দূরদর্শী নয়, তাহারা কি করিয়া আপনাপন মঙ্গলের জন্ত ভায় বা নীতি-বুদ্ধি স্বজন করিবে ?

নীতি বা ভায় প্রেম বা পরোপকারেচ্ছা যে অজ্ঞানোৎপন্ন কৃত্রিম অন্ধ শিক্ষণীয় বুদ্ধি নয়, মহাত্মা এভু ক্রাইস্ট তাহা একটী প্রমাণ। যেখুন, খৃষ্ট যখন সংসারের দিকে চাইলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন, সংসার নরকধিরে প্রাবিত হই-তেছে। ইহা দেখিয়া পরের অনিষ্টকরা মন ও পরের ইষ্ট করা ভাল এই নীতি তাঁহার হৃদয়ে স্বতই উদ্ভিত হইল। বাহারা নীতিকে কুবুদ্ধিশালি-মানবের স্বষ্ট বলেন, তাহারা যেখুন, ঐ ভাব কৃত্রিম বা অকৃত্রিম।

শিশু ভ্রমবশতঃ জলকে স্থল জ্ঞান করে, তাহার পর বয়ো-বৃদ্ধি সহকারে জ্ঞান দ্বারা জলকে জল এবং স্থলকে স্থল বলিয়া জানে। অজ্ঞ শিশু প্রথমে জলকে স্থল জ্ঞান করিয়াছিল বলিয়া ঐ শিশু যখন কাল সহকারে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার কি উচিত, আদি ভ্রমজ্ঞানকে সহজাত জ্ঞান বলিয়া গালন করা ? এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে সত্য জ্ঞানকে উপেক্ষা করা ? জ্ঞানই আশ্রয় ধর্ম, অজ্ঞানই আশ্রয় অধর্ম, ইহা নিশ্চয় জানিয়া সকল জন্মের জ্ঞানকে আপন বস্তু বলিয়া গ্রহণ করা সত্যের অনু-ধোঁকিত। আমার ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, মানবের আদি-বাবুয়ার খাৰ্চ-সাধনবুদ্ধি দ্বারা নীতি উৎপন্ন হইলেও (যাহা আমি স্বীকার করি না) তাহা গালন করা কর্তব্য নয়; কারণ তাহা-

আত্মার অধঃপতন। সে বাহ্য হউক, অতিথি দ্বারা সমাজের কি অনিষ্ট হয়, তাহা আপনার নিকট হইতে শুনিতে চাই।

গৃহস্থামিনী। মনে করুন, একটী দেশে সহস্র লোক আছে ; উদ্ভ্রম্যে যদি ২০০ শত লোক অলস হয়, তাহা হইলে সমাজের কি বলহীন ও আয়হীন হইবে না ? অবশ্য হইবে। কোন সচ্চরিত্র অজ্ঞানশীল লোকের বতরণ কোন অলস লোক গলগ্রহ না হয়, ততক্ষণ তিনি আপনার ও স্বদেশের সম্পূর্ণ উন্নতিসাধন করিতে পারেন, কিন্তু কোন অলস ব্যক্তি তাঁহার গলগ্রহ হইলে, তাঁহার উন্নতির ব্যাঘাত হয়। যে ব্যক্তি গলগ্রহ হয়, সে অজ্ঞান বশতঃ আপনার শরীরের ও মনের সম্পূর্ণ অনিষ্ট সাধন করে। তাহার কারণ পূর্বেই একপ্রকার বলা হইয়াছে। আবার সেই কণ্ঠ্যপ্রকারান্তবে বলা বাইতেছে। মন ও শরীর চালনা না করিলে মন ও শরীরের জীবন থাকিয়াও যেন থাকে না, কারণ জড় শত্রু আসিয়া উহাদ্বয়কে গ্রাস করে। এইরূপ একটী সমাজের কতকগুলি লোক শক্তি থাকিতেও বিনা কারণে সমাজের গলগ্রহ হইলে সমাজের আর উন্নতি হয় না, বরং সম্পূর্ণ অধোগতি হয়।

প্রভো। অধিকাংশ মানবের মন অজ্ঞানে জড়িত, তজ্জন্ত তাহারা সুবিধা পাইলেই কুপথে গমন করে।

যদি সমাজে এরূপ নিয়ম চলিত থাকে যে, যেপ্রকার অতিথি হউক না কেন, তাহাকে দ্বান করিতে বা আহার দিতে হইবে, তাহা হইলে অধিকাংশ লোক “পরিশ্রম না করিলেও বাইতে পাইব” এই ভাবিয়া পরিশ্রমবিমুখ হইয়া যুতবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া

ধাক্কাবে এবং সমাজের ধ্বংসপথ পরিষ্কৃত হইবার অল্প গোঁণে বা অগোঁণে ধ্বংস হইবে ।

মোহান্ত । একথা বুঝিলাম । বেবি ! সমাজ ধ্বংস হউক আর বাহা হউক তাহাতে ধর্মের কি ? বাহার অধার্মিক, কেবল ইহলোক লইয়া সমাজ সমাজ করিয়া মরে, তাহারাই সমাজ দেখিবে । সমাজের তার ধর্মের নয়, ঈশ্বরোপসনা করাই ধর্মের কার্য্য । ঈশ্বরোপসনার আমাদের উপকার আছে । উহাতে বধন উপকার আছে, তখন ঈশ্বরোপসনা করিব না কেন ? এবং তোমা হেন ধার্মিকার সাহায্য পাইব না কেন ?

গৃহস্থামিনীর নাম শুনিলাম প্রতিভা । এইবার হইতে গৃহস্থামিনীকে প্রতিভা বলিয়া ডাকিব ।

প্রতিভা । বাহারা মানব-সমাজের অন্তর্গত হইয়া মানব-সমাজের হিতাহিতের দিকে লক্ষ্য না করেন, তাহারা আত্মজ্যোতী মহাপাপী । তাহাদিগকে আত্মজ্যোতী মহাপাপী বলি কেন ? সমাজই মানবের সম্পূর্ণ আত্মা । বিবিধ শস্ত্র, লবণ, তৈল, সীত-বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি অসংখ্য উপকরণ যদি আমরা সমাজ হইতে না পাইতাম, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেক দেহহু আত্মা থাকিত না । সমাজের সহিত যদি আমাদের আত্মা না মিলিত, তাহা হইলে, প্রেম দয়া প্রভৃতি আত্মা বিকাশ পাইত না, হুতরাং আত্মা থাকিয়াও থাকিত না । একদেহহু আত্মা সমস্তদেহহু আত্মার সহিত ও আত্মোপকরণ ভৌতিক পদার্থের সহিত মিশিলে তিনি সম্পূর্ণতা লাভ করেন, হুতরাং সমাজ না থাকিলে আমাদের আত্মা সম্পূর্ণতা লাভ করিতেও পারে না । এই সমস্ত দেখিয়া বলি, সমাজও বাহা, আত্মাও তাহা ।

যিনি ঈশ্বর সমাজকে অবহেলা করিয়া অনিষ্ট করেন, তিনি আত্মদ্রোহী মহাপাপী। তাহা বলিয়া মনে করিবেন না যে, আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই, আমরা কেবল সমাজের অধীন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লইয়াই সমাজ থাকে। আপনাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা না থাকিবার কারণ আপনাদিগকে সমাজব্যবসায়ী বলিতেছি। প্রভো। আপনারা যখন সমাজের হিতাহিতের দিকে লক্ষ্য না করেন, তখন সমাজ আপনাদিগকে আহার যোগাইবার জন্য দায়ী হইতে পারে না, এবং আপনাদিগকে সমাজের পাপ বিবেচনা করিয়া সমাজ হইতে তাড়িত বা ধ্বংস করা সমাজের অবশ্য করণীয়। ধ্বংস বলিলে আপনাদিগকে একবারে হত্যা করা বলিতেছি না, আপনাদিগের পাপবুদ্ধির ধ্বংসের কথা বলিতেছি। আপনাদের পাপ (যাহা এখন আপনারা) ধ্বংস হইলে আপনাদের আত্মা নির্মল হইয়া উদ্ভিত হইবে। আপনাদিগের পাপধ্বংসের জন্য আপনাদিগকে সমাজ হইতে সরাইয়া আত্ম-সংশোধক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া সমাজের অবশ্য করণীয়। আপনাদের আত্মাংশ-সমূহকে সুতরাং আত্মাকে পাপ হইতে মুক্ত না করা সমাজের আত্মহত্যা-মহাপাপ, সুতরাং পাপগ্রস্ত লোকদিগকে উদ্ধার না করিলে সমাজকে ও প্রত্যেক-দেহস্থ আত্মাকেও আত্মহত্যা-মহাপাপে থাকিতে হয়। এই মহাপাপ ক্রমে ক্রমে সমাজ ধ্বংস করিয়া ফেলে, সুতরাং আপনাদের মহাপাপ ধ্বংস করা সমাজের প্রত্যেকদেহস্থ আত্মারই কর্তব্য, কেবল কর্তব্য কেন না, করিলে নয়। পাপ ধ্বংস করাই আপনাদের উপকার। আহার বা অর্থদান দ্বারা আপনাদের উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রভো। এক দিক দেখিবেন না।

সমাজকে আমাদের প্রাণ বলিবার কারণ সমাজকে একটা অপর বস্তু খাড়া করিয়া আমাদের সমাজের অধীন ভাবিবেন না। আমাদের লইয়া সমাজ। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে অর্থ দেয় বলিয়া সমাজের নিকট লবণ তৈলাদি পায়, হুতরাং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যায় না। উত্তর দিক্ দেখিলে সমাজ ও প্রাণ এক।

এতো! আপনি বলিলেন, ধর্ম সমাজের কেহ নয়। ধর্ম যদি সমাজের কেহ নয়, তাহা হইলে সমাজও ধর্মের কেহ হইতে পারে না। ধর্মকে তাড়াইতে বা ধ্বংস করিতে সমাজ বাধ্য। যে ধর্ম সমাজের হিতের জন্য বঁট হয় নাই, সে ধর্ম সমাজে থাকিতে পারে না, এবং সে ধর্ম ধর্মই নয়, তাহাব অস্তিত্ব অন্বায়ী। আমি জানি, ঈশ্বর যিনি, তাঁহাকে আপনারা, কেবল আপনারা কেন—আন্তিকমাত্রেই জগতের মঙ্গলাকাজী বলিয়া বিশ্বাস করেন। যিনি জগতের মঙ্গলাকাজী, তিনি জগতের মঙ্গল কার্য করিতে দেখিলে আমাদেরকে ভাল বাসিবেন। তিনি আপনার পুত্রদিগকে আপনাদের কার্য দ্বারা আপনাদের অমঙ্গল করিতে দেখিবা কি সন্তুষ্ট হইতে পাবেন? কখনই হইতে পারেন না। ঈশ্বর যদি জীবের মঙ্গলাকাজী হন, যে পথে চলিলে জীবের মঙ্গল হয়, সেই সকল পথে চলা তাঁহার অনুমোদিত ও তাঁহার নির্দিষ্ট নিষম হইয়া উঠে। তাঁহার আজ্ঞা পালন না করিয়া অর্থাৎ জগতের মঙ্গলাকাজীর অনুমোদিত পরোপকার-রূপ মঙ্গলপথে না চলিয়া কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া ডাকিলে বা অর্চনা করিলে তিনি কখন সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। নিশ্চয় জানিবেন, পরোপকার রূপ পথে চলা আমাদের অশেষ মঙ্গল। মনে করুন, আপনি ঈশ্বরের স্তা

পরোপকারী। একজন দরিদ্রের হৃদয়ে দয়াত্রু হইয়া আপনি যেমন আমাব ও দরিদ্রের মঙ্গলের জন্য আমাকে বলিলেন, প্রতিভা। ঐ ব্যক্তির আহ্বারের উদ্যোগ করিয়া দেও। আমি যদি দরিদ্রের আহ্বারের উদ্যোগ করিয়া না দিয়া কেবল আপনার খোঁচামোচ করি, তাহা হইলে, আপনি কি আমার প্রতি রাগ করিবেন না? আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কি আমাকে পুরস্কার করিবেন? যে পথ আপনার অনুমোদিত নয়, কারণ যে পথে আমার অশেষ অমঙ্গল-শত্রু বহিয়াছে, সেই পথে যদি আমি বাই, তাহা হইলে, আপনি কি ক্রোধ করিবেন না? অবশ্য করিবেন, কারণ আপনি পরোপকারী। যিনি পরোপকারী, তিনি প্রশংসা প্রভৃতি আপনার স্বার্থমাত্রকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করেন। তিনি কেবল পরোপকাররূপ মঙ্গল-পথে চলিতে দেখিলে সন্তুষ্ট হইবেন। এই সুক্তি অনুসারে ঐহারা মঙ্গল-কাজী ঈশ্বরকে কেবল গুণকীৰ্ত্তন করেন ও মন প্রাণ ঐক্য করিয়া ভাবেন, অথচ পরোপকার-রূপ পথে চালিত হন না, তাহারা অবশ্য ঈশ্বরের ক্রোধে ভাজন হইবেন। দণ্ডদাতা ঈশ্বর তাহাদিগকে অবশ্য দণ্ড দিতে পাবেন। আপনার মতে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করাই যদি ধর্ম হয়, ঈশ্বরোপসনা প্রভৃতি নিষ্কল কার্য দ্বারা তাহা হয় না, মঙ্গলময় পরোপকার-রূপ পথে চলিলে তাহা হয়। দেখুন, এই সুক্তিতে আপনার ধর্ম উদ্ভিষ্ট হইতেছে কি না? এবং আপনাকে কেবল দণ্ডের কারণ হইতেছেন কি না?

মোহান্ত। উত্তম কথা, যদি আমরা পাপ করি, ঈশ্বর আমাদের দণ্ড দিবেন, মানবসমাজ দণ্ড দিবার কে?

প্রতিভা । আপনার কথাগুলোই মঙ্গলময় ঈশ্বর স্বীকার করিয়া দেখাইলাম যে, পরোপকাররূপ পথে না চলিলে তিনি দৃষ্ট হইবেন না, নতুবা ঈশ্বরসম্বন্ধে আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই এবং ঈশ্বরসম্বন্ধে কোন বিচার করিতেছি না, কেবল সমাজসম্বন্ধে কথা কহিতেছি । কথাপ্রসঙ্গে সমাজের মঙ্গল ও অমঙ্গল বাহা পড়িতেছে তাহাই বিবৃত হইতেছে । ঈশ্বর যদি সমাজের অমঙ্গল পর্বার্থ হন, তাহা হইলে সত্যের অনুরোধে বিবৃত করিতে হইবে । উজ্জ্বল বলিতে হইতেছে যে, পাপীৱ দণ্ডভার ঈশ্বরে অর্পণ করিলে সমাজ উৎসন্ন হইয়া বাইবেক, কারণ তিনি অপ্রত্যক্ষ, সুতরাং তাঁহার দণ্ড অপ্রত্যক্ষ । এই অপ্রত্যক্ষ কারণে আমি দেখিতে পাই, পাপী তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) মুখে স্বীকার করিলেও কার্যতঃ নীকাব করে না । মানবের আর্থিক ও মানসিক কষ্ট দেখাই পাপীর কার্য, সুতরাং পাপীকে দণ্ড দেওয়া মানবসমাজের অবশ্য করণীয় হইয়া উঠে । দণ্ড দ্বারা পাপ ক্রাসতা প্রাপ্ত হয় । এই কারণে পাপীকে দণ্ড দেওয়া উচিত ।

মোহান্ত । দেবি । আপনি যে যে মত বলিলেন, এ মতের কোন কোন মত ইংরাজের চর্কিতচর্কণমাত্র । ইংলওবাসীদের যে মত তাহা ভারতবাসীদের হইতে পারে না ।

প্রতিভা । প্রভো । আমি জানি না ঐ মত ইংরাজের কি না, কারণ আমি মূর্খ জ্ঞীলোক । যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, সত্য কি ইয়োরোপীয়দের একচেটিয়া ? কখনই নয়, তবে আধুনি ইহার কোন কোন মত ইংরাজের চর্কিতচর্কণ বলিতে পারেন না । প্রভো । আমি মূর্খ জ্ঞীলোক, ইয়োরোপীয় কোন

ভাষা জানি না, কেবল স্বামীর কল্যাণে স্বাধীন-চিন্তা-শক্তি পাইয়া উক্ত সকল মত জানিতে পাবিয়াছি। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, সত্য সকলেরই চিন্তালব্ধ। ইয়োরোপীয়দের অনেক মত বহু পূর্বে ভাবতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহা বলিয়া আমি বলিতে চাই না যে, পাশ্চাত্য মত বাহা ভারতবর্ষে পূর্বে আবিষ্কার হইয়াছিল তাহা ইংরাজদের আবিষ্কৃত নয়। কারণ ভাবতবর্ষীয়েরা বেকপপ্রকৃতি বা মানব ও অদ্ভান্ত জীবপ্রকৃতির কোল হইতে সত্য (কারণ উহাই সত্য-স্থান) আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, ইয়োরোপীয়েরা সেইরূপ করিয়াছেন, তবে ইয়োরোপীয়েরা ভারতবর্ষীয়দের মতাবলম্বী হইবেন কেন? অগ্রে আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া ভাবতবর্ষীয়দিগকে কি প্রাধান্য দিতে হইবে? “প্রকৃতি” ভাবতবর্ষীয়দিগকে অগ্রে জন্মাইয়া বা অবস্থায় কেলাইয়া সত্য আবিষ্কারের সম্বন্ধ তাঁহা-দিগের নিকটে উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ইয়োরোপীয়দিগকে ঐরূপ কবিলে উহাঁবাও ঐরূপ করিতে পাবিডেন, অবস্থা হইতে সত্যোৎপত্তি হয়। ভাবতবর্ষীয়েরা অগ্রে অবস্থার পড়িয়াছিলেন, সুতরাং তাহাতে তাঁহাদের প্রাধান্য কিসের?

আপনি বলিলেন, ইংরাজের সত্য এদেশে খাটিতে পারে না। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ইংরাজ বা ভারতবর্ষীয়রাপেক্ষা পূর্ব্বতন জাতিরা আহাৰ করে বলিয়া ভারতবর্ষীয়রা কি আহাৰ করিবে না? “জীবনদায়ক পদার্থ আহাৰ করিলে জীবন রক্ষা পায়” এ সত্য কি সকল দেশে সমান নয়? যখন ঐ সত্য সকল দেশের সত্য ভাবিয়া সকল জাতি এবং আপনারাও আহাৰ করেন, তখন আপনার ও আপনার মতাবলম্বীদের ভাবা উচিত,

আগি যে সত্য বলিলাম, ঐ সত্য আমাদের উপযোগী কি না । যদি উহা আমাদের উপযোগী বিবেচনা করেন তাহা আপনাদের সত্য ভাবিষ্য ব্যবহার করিবেন না কেন ?

আপনি অতিথিসম্বন্ধীয় যেসত্য ইংরাজদের আবিষ্কার ভাবিতেছেন তাহা, অসংখ্য হিন্দুগ্রন্থের মধ্যে কোন না কোন গ্রন্থে বিকাশ থাকিকে পাবে, যদি না থাকে, এদেশে ইংবাজি মত প্রবেশ না কবিলেও একদিন না একদিন উহা বিকাশ হইত, কারণ ঐ সত্য ভাবতবর্ষীয়দেরও জীবনোপযোগী । যখন অধিকাংশ লোক শক্তি থাকিতেও অতিথির্হিত অবলম্বন কবিবার কাবণ সমাজ অংগপাতে বাইত, তখন ঐ সত্য আবিষ্কারের সময় । দেখা যায়, যখন যে সমাজ যে বিপদে পড়িয়াছে, সেই সময় সেই বিপদহ্রাসের সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে । উজ্জয় বলিতেছি যে, সমাজের অধিকাংশ লোক অতিথি হইলে ঐ সত্য আবিষ্কৃত হইত । যদি ঐ সত্য আবিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে, সমাজ জীবনব্যয়ক-উক্ত-সত্যভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত-হইত, কারণ ঐ সত্য সমাজের জীবনস্বরূপ ও প্রকৃত উপযোগী ।

মোহান্ত । ভাবিয়া দেখিলাম, ইংরাজ ও অস্ত্রান্ত বৈদেশিকদের মূল সত্য সকল যখন ভাবতবর্ষীয়দের মূল সত্য সকলের সহিত এক হইল, তখন সকল জাতি কি এক ? ইংবাজ ও অস্ত্রান্ত বৈদেশিকদিগের মানসিক গুণের সহিত যখন ভারত বর্ষীয়দের মানসিক গুণের ঐক্য হইতেছে তখন সকলে কেন না একজাতীয় হয় ।

প্রতিভা । প্রকৃতির যে যে উপকরণে ভাবতবর্ষীয়েরা গর্ভিত হইয়াছে, ইংলণ্ডীয় ও অস্ত্রান্ত বৈদেশিকেরাও যদি সেই সেই

ভৌতিক উপকরণে গঠিত না হইত তাহা হইলে, তাহারা ভারত-বর্ষীয়দের হইতে এক স্বতন্ত্র জীব হইত । অর্থাৎ তাহারা ভারত-বর্ষীয়দিগের মত মানবাকার হইত না এবং তাহাদের দ্বারা সাহস প্রেম ইত্যাদি কোন গুণ থাকিত না , সুতরাং তাহাদের আশ্রয় সহিত ভারতবর্ষীয়দিগের আশ্রয় কোনপ্রকার সাদৃশ্য থাকিত না । ইংলও প্রভৃতি বৈদেশিকদিগেব আশ্রয় সহিত ভারত-বর্ষীয়দিগের আশ্রয় সাদৃশ্য দেখিয়া “তাঁহারা সকলে যে এক” ইহা প্রত্যক্ষ বুঝা যাইতেছে ।

প্রভো ! আপনি বলিতে পারেন “তবে পবম্পবের বর্ণের, আহারের ও পরিচ্ছদের পার্থক্য কেন ?” ইহার কাবণ এই, বৈদেশিক ভূমিতে কোন কোন ভৌতিক পদার্থের (যেমন শৈত্য, বা তাপের) প্রভাব বেশী বা কম , তাবতবর্ষে সেই সমস্ত ভৌতিক পদার্থ আছে, তবে বেশী বা কম । সেই কারণেই আমাদের সহিত তাহাদের পরিচ্ছদাধির বিভিন্নতা অল্পপরিমাণে লক্ষিত হয় , কিন্তু এক হিসাবে প্রকৃতির যে যে উপকরণ-ভাগে মানবের শরীর ও প্রাণ বহ্ন, সেই সেই উপকরণভাগে সর্ববৈদেশীয় মানবের শরীর ও প্রাণ বহিয়াছে । প্রকৃতির যে যে উপকরণ-ভাগে ভারতবর্ষীয়দের শরীর ও প্রাণ থাকে, অন্যান্য বৈদেশীয়দের সেই সেই উপকরণ-ভাগে শরীর ও প্রাণ থাকে । দেখুন, ইংলওবাসীদিগের শৈত্যনামক ভৌতিক উপকরণ বেশী এবং তাপ উপকরণ অল্প, এজন্য ইংলওবাসীদিগকে কৃত্রিম উপায়ে অর্থাৎ তাপপূর্ণ পরিচ্ছদ, ভক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় দ্বারা অন্যান্য দেশের মানবের প্রাণ ষতপরিমাণ তাপে রক্ষা হয়, সেই পরিমাণের তাপ কৃত্রিম উপায়ে শরীরে রক্ষা

করিতে হয়। এই কারণে ইংলণ্ডবাসীদের পরিচ্ছদ, আহার ও পাণীয় ভারতবর্ষীয়দিগের হইতে প্রভেদ। ‘ইংলণ্ড’ অল্পপরিমাণে তাপ দেয় বলিয়া অর্থাৎ সেখানকার প্রকৃতি দেখিয়া তাপ দেয় না বলিয়া ইংলণ্ডবাসীদিগকে তাপপূর্ণ পরিচ্ছদাদি দ্বারা তাপ লইতে হয়। আবও দেখুন, ভারতবর্ষ তাপপ্রধান দেশ, এখানে শৈত্যের ভাগ কম, এই কারণে ভারতবর্ষীয়দিগকে স্নানাহার প্রভৃতি দ্বারা প্রকৃতির শৈত্য-উপকরণ (বতটুকু শৈত্য-উপকরণে প্রাণ থাকে) শরীরে আনয়ন করিতে হয়। ইহা দেখিয়া বলিতেছি, প্রকৃতির যে যে উপকরণের ভাগ দ্বারা ভারতবর্ষীয়দের প্রাণ সৃষ্ট হইয়াছে ও বহিয়াছে, সেই সেই উপকরণের ভাগ দ্বারা সর্বদেশীষ মানবের প্রাণ সৃষ্ট হইয়াছে ও রহিয়াছে।

মোহান্ত। দেবি। আমরা যদি সকলে এক হইলাম, তবে ইংরাজ ও মুসলমান প্রভৃতি গোষ্ঠীকদের সহিত একত্রে আহার করিব কি?

প্রতিভা। ইংরাজ ও মুসলমান প্রভৃতি সকলে একজাতীয় হইলেও ইংরাজ ও মুসলমানদের দ্বাৰা সকল আমাদের বা তাঁহাদের কেহ নহ। তাঁহাদিগকে সকলের শত্রু ভাবিয়া ধ্বংস করা সকলের অবশ্য করণীয়। এই জ্ঞানের হিসাবে ইংরাজ ও মুসলমান প্রভৃতি গোষ্ঠীকদের গোহত্যা-দ্বাৰা গোরক্ষক পুণ্যাত্মাদের উচিত নয় যে, ঐ পাপের প্রভাব দেওয়া অর্থাৎ তাঁহাদের উক্ত দ্বাৰাকে ঘৃণা না করিয়া তাঁহাদের সহিত একত্রে আহার করা। ইংরাজ ও মুসলমান প্রভৃতি গোষ্ঠীকদেরও উচিত নয় যে, গোরক্ষক পুণ্যাত্মারা মাতৃপিতৃসম গোতুল ধ্বংস

করিবার জন্ত তাঁহাদিগকে হুণা করেন বলিয়া ঐ পুণ্যাত্মা মঙ্গলা-
কাজী ভাতাদিগের উপর ক্রোধ করা বা ভ্রমে হুসংস্কারাপন্ন
ভাবিয়া তাঁহাদের কথা ভাঙল্য করা। বেকপ লোক বেকপ
কথা বলুক না কেন, তাহা সার কি অসার তাবা উচিত। ইহাতে
আমাদের যুক্তি মার্জিত হইয়া সত্যালোকে আলোকিত হয়।
পাপকে হুণা করিলে পাপ আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না,
বিমলচন্দ্রের স্তায় আত্মা বিকাশ পাইয়া থাকে এবং আত্ম-শত্রু
পাপ হ্রাসতা প্রাপ্ত হয়। এই এই কারণে গোরক্ষক পুণ্যাত্মারা
গোখানকদিগকে হুণা করেন। তজ্জন্ত তাঁহাদিগের মঙ্গলাকাজী
গোরক্ষ ভাতাদিগের উপর কি ক্রোধ করা বা তাঁহাদিগকে হুর্খ
ভাবা উচিত ?

তাই প্রমদাচরণ। অব্য রাত্রি অধিক হইয়াছে, শরীর
নিজাবেশে অলস হইতেছে। অতএব বারান্তরে এই ঘটনার
অবশিষ্টাংশ বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

তোমার

শ্রীসরোজকুমার বসু।

তৃতীয় পত্র (পীড়িতা-লিখিত)।



ভাই ! তোমার স্বাধীন-চিন্তা-বিষয়ক পত্রখানি পাঠ করিয়া
জ্ঞানান্বিত হইলাম। বতদিন ভাবতে স্বাধীন-চিন্তা-শক্তি ছিল,
ততদিন কপিল গৌতম প্রভৃতির জ্ঞান দর্শনকার, তাস্করাচার্য্য
বরাহ প্রভৃতির জ্ঞান জ্যোতির্বিদ, মনু পরাশর প্রভৃতির জ্ঞান
স্মৃতিকার, উত্তরভারতী লীলাবতী প্রভৃতির জ্ঞান রমণীরত্ন, বাগ্মীকি
ক্যাস প্রভৃতির জ্ঞান কবি, সুশ্রুত বাগ্‌ভট প্রভৃতির জ্ঞান চিকিৎসা-
শাস্ত্ররচয়িতা, পাতঞ্জল বশিষ্ঠ প্রভৃতির জ্ঞান যোগ-শাস্ত্র-প্রণেতা
প্রভৃতি কতই বহু জ্ঞান গ্রহণ কবিয়াছিলেন এবং উহাদের দ্বারা
জ্ঞানজগতে কতই অমূল্য জ্ঞানরত্ন আকিঞ্চত হইয়াছিল। ভ্রম-
বশতঃ যখন ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে নরদেবতা করিবার আশা
কৃত্রিম বৈষ্ণ শূত্র জাতিদিগকে জ্ঞানচর্চা হইতে রহিত করি-
লেন, শাস্ত্রবিরুদ্ধকথাকে মহাপাপ, শাস্ত্ররচয়িতাদিগকে দেবতা,
অস্ত্রদিগকে মানব ও আপনাদিগকে দেবপুত্র বলিয়া প্রচার
করিলেন, সেইদিন হইতে ভারতে চিন্তা-শক্তি লুপ্ত হইল,
এবং তাহাদের মায়াজালে বদ্ধ হইয়া তদীয় বংশজগণও
জড় হইয়া রহিল। আমি দেখিয়াছি, একজন গোষ্ঠী ব্রাহ্মণ
স্বয়ং কৃত্রিম জানিয়াও কেবল অর্থলাভাশায় একটা মুড়িকে
জাগ্রত দেবতা বলিয়া ঘোষণা কবিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার
বংশজগণ ঐ মুড়িকে সত্য সত্যই দেবতা বলিয়া ভয়, ভক্তি ও
উপাসনা করিত।

আত্মমর্যাদা-জ্ঞান স্বাধীন-চিন্তার জনক ও স্বাধীন-চিন্তা
 জীবনের পরিচায়ক । আত্মহীনতা-জ্ঞান স্বাধীন-চিন্তা-লোপের
 জনক এবং লুপ্ত-স্বাধীন-চিন্তা মানবের জীবন-ত্বার পরিচায়ক ;
 সুতরাং সকলে ব্রাহ্মণগণ হইতে আত্মহীনতাজ্ঞান পাইয়া
 বাচিয়াও মরিয়া রহিল । পূৰ্বপুরুষদিগের আদেশ ঘোষণা
 করিবার কারণে কেবল ব্রাহ্মণপুত্রেরা দেবপুত্র বলিয়া এবং
 আপনাদিগকে দেবরচিত শাস্ত্র সকলের অধিকারী বলিয়া অপর
 তিন জাতির নিকট দেবভাবে পূজনীয় হইতে লাগিল এবং সকলে
 কীৰ্ত্তি-বুদ্ধি হওয়াতে শাস্ত্ররচয়িতা, শাস্ত্রজ্ঞ, ষাণ্ড, ললিত প্রভৃতি
 অসংখ্য পদার্থ দেবভাবে তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতে
 লাগিল । ঐপ্রকার হওয়া মিয়ম । কারণ অল্পশক্তি ব্যক্তি মহাশক্তি
 দেখিলেই তাহাকে দেব ভাবিয়া মাথা নোয়াইবে । মানবের
 শক্তি যত বিকাশ হইতে থাকে, ততই তাহার নিকট হইতে
 দেবগুলি একে একে অন্তর্হিত হইতে থাকে । অল্পবিকশিত-
 শক্তি মানবের মন হইতে প্রথমে অতি ক্ষুদ্র দেব অন্তর্হিত
 হইতে আরম্ভ করে, শক্তিবিকাশের সহ ক্ষুদ্রের পূৰ্ব পূৰ্ব দেব-
 গুলি অন্তর্হিত হইতে থাকে এবং যখন মানবের মনে শক্তি
 সম্পূর্ণ বিকাশ হয়, তখন সর্বোপরি দেব অদৃশ্য হইয়া থাকে ।
 শক্তিবিকাশের সহিত যেমন দেবগুলি ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত
 হইয়া পড়ে, সেইপ্রকার শক্তিহীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেবগুলি
 আবির্ভূত হইয়া পড়ে । ইহা মনো-জগতের নিয়ম । ঐ নিয়ম
 জানিয়া ব্রাহ্মণগণ সকলকে কীৰ্ত্তিশক্তি করিয়াছিলেন ।

তাই । ভাবিবে না যে, আমি নাস্তিকতা প্রতিপন্ন করিবার
 জন্য উহা লিখিলাম । মনোজগতের নিয়ম দেখিয়া কথাপ্রসঙ্গে

উঁহা না লিখিলে নয় বলিয়া লিখিলাম । প্রতিজ্ঞা করিয়া জ্ঞান-
লোচনা করিতেছি । জ্ঞানালোচনা করিতে করিতে আন্তরিকতা-
স্থাপন বা নাস্তরিকতা-উচ্ছেদ, নাস্তরিকতা-স্থাপন বা আন্তরিকতা-
উচ্ছেদ হয় হউক, আমি সে দিকে লক্ষ্য করিব না । যাহা
হউক আমি স্বশক্তিকে কোটী কোটী নমস্কার করি । শক্তিই
সমস্ত হুঃখ হইতে লোককে মুক্ত করেন, শক্তিই মুক্তি ।
অজ্ঞানচ্ছন্ন জগৎ হইতে শক্তি ভিন্ন লোক মুক্তি হইবে কি
প্রকারে ? এমন শক্তিকে যাহারা নিন্দা করেন, তাঁহাদিগকে
আমি মহাপাপী বলিয়া ঘৃণা করি, এবং ঘৃণা করিতে সকলকে
অনুরোধ করি । আমাব এই কথাতে হৃদয় শক্তি উপাসনা-
ঘেবীরা শক্তির গুণকীর্তন শুনিয়া ভ্রমবশতঃ জলিয়া উঠিবেন,
কারণ শক্তিমাত্রকে তাঁহারা মন্দ বলিয়া জানেন । এক্ষণে এই
কথা রাখিয়া বলি, আমি একটা স্ত্রীলোকের পত্র পাইয়াছি,
তোমার পাঠার্থে তাহা অবিকল লিখিয়া তোমার নিকট
পাঠাইলাম ।

বাল্য স্মৃতি । ভূমি কি আমাকে ভুলিয়াগিয়াছ ? সরলতা-
রয় বাল্যকালের সেই ঘুলাবেলা, লুকাচুরিবেলা, পাখী, কুকুর
ও ফড়িং প্রভৃতি জীবপোষা ইত্যাদি আমোদজনক কার্য্যেব
সঙ্গিনীকে ভূমি কি ভুলিয়াগিয়াছ ? বোধ হয়, ভূমি অনেকের
মত বাল্যকালের সেই আমোদজনক কার্য্যগুলিকে মূল্যহীন
ভাবিয়া বিজ্ঞ হইয়াছ । অস্বপ্নস্বপ্নকারক কার্য্যগুলিকে যাহারা
মূল্যহীন ভাবেন, তাঁহাদের বিজ্ঞতাকে আমি প্রশংসা করিতে
সম্মত হই । আমার জ্ঞানে যে কার্য্যে আনন্দ লাভ হয়,
তাঁহাই মানবের কার্য্য, তাঁহাই মানবের করণীয় এবং যে কার্য্যে

আত্মসুখলাভ না হয়, তাহাই দুঃখহীন, তাহাই মানবের অকার্য্য, তাহাই মানবের বর্জনীয়। সে বাহা হউক, তুমি শুন আর না শুন, তোমাকে বাণ্যবদ্ধ ভাবিয়া আমি আজি তোমার নিকট আপনার হৃৎকের কথা পাড়িতেছি। হৃৎক প্রকাশ করিলে হৃৎকের প্রকোপতা হ্রাস হইয়া যায়, এই কারণে আমি তোমার নিকট হৃৎকের কথা বলিতে মসিলাম।

ভাই! বিবাহের বহুদিন পরে যে দিন তোমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বশ্রবণাভী আসিলাম, সেই দিনই আমার হৃৎকের দিন গত হইয়া হৃৎকের রাত্রি উপস্থিত হইল। বিবাহ-কালে আমি স্বামীকে বৃদ্ধ দেখিয়াছিলাম যটে, কিন্তু তখন জানি না যে ঐ বৃদ্ধই আমার জীবনের সহচর হইবেন। তিনি পিতার ভুল্য, তাঁহাকে স্বামী বলিয়া ভাবিতে হইবে, ইহা আমি তখন বুঝিতে পারি নাই, জানিলে এইরূপ আকস্মিক হৃৎকে আক্রান্ত হইব কেন ?

লগ্নবল-বর্ষবয়স্কা দুবতীর ষাটি-বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ স্বামী দেখিয়া আমি কাদিলাম, অবশেষে কপালের সিঁধি খুঁটাইবার নথ ভাবিয়া বৃদ্ধ স্বামীর সহিত মন মিলাইতে বহু চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু হায় কিছুতেই মন মিলিল না। অবাধ্য মনকে বাধ্য করিবার জন্য আমি পতিভক্তিহীনতার শাস্ত্রোক্ত শাসন সকল সর্ব্বদা মনন করিতে ও সময়ে সময়ে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বহুদিন ঐপ্রকার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মন কিছুতেই বাধ্য হইয়া স্বামীর সহিত মিলিল না, পরিশেষে পরাস্ত হইয়া ভাবিলাম, ঈশ্বর আমিলেও অন্তর ও বহির্জগতের সিরস বলপূর্ব্বক ভাঙিতে পারেন না। স্বামী বৃদ্ধ, অশেষগুণশালী, তাঁহাকে

আমি ভক্তি করিতে পারি, কিন্তু প্রেম (পরস্পর সমভাবে থাকিলে যে ভাব জন্মে) করিতে পারি না । স্বামীর সহিত আমার প্রেম হইল না । এইপ্রকার ভাবে দুই বৎসর কাটিয়া গেল ।

একটা নদীর পশ্চমদিকের বাঁধের উপর আমার স্বপ্নরবাড়ী । তাহার বিপরীতদিকের বাঁধের উপর একদিন অপরাহ্নে আমি একটা যুবককে বেড়াইতে দেখিলাম । তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহার মনটা যেন আমার মনের মত । বোধ হয়, যুবকও আমাকে দেখিয়া ভাবিতেছিলেন, তাঁহার মনের মত আমার মন ; কারণ তিনি আমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আমার দিকে বারংবার হাসিমাখান দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতেছিলেন । আমিও তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ঘোমটার ভিতর হইতে হাসিমাখান দৃষ্টি ঘন ঘন নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলাম ।

হাসিমাখান দৃষ্টি ! তোমার অসীমক্ষমতা । তুমি যুবকযুবতী দ্বিগকে বাঁধিয়া সংসারে নিয়ত নাচাইতেছ । তুমিই ফুলবতীকে কুল হইতে বাহির করিয়া আন । তুমিই যুবককে পাগল করিয়া তুল । তুমিই অপরিচিতের সহিত অপরিচিতের মিলন করিয়া দেও ।

তাই ! ঐ হাসিমাখান দৃষ্টি আমার ও ঐ অপরিচিত যুবকের হৃদয়ে হৃদয়ে যেন স্বর্ণ সোহাগার স্নায়মিলন করিয়া দিল । এত দিনের পর প্রথমপাত্র পাইয়া জীবন যেন নব জীবন পাইল । এক এক বার মনে গুরুজন ও নরকাধির গুরু আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহা তাহাতে অধিকক্ষণ স্থান পাইল না । ক্রমে ক্রমে রাত্রি হইল । গৃহকার্য্য তুলিয়া আমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম ।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে আমি প্রথম পাপিনী। প্রথম পাপীকে প্রথমে কেহ পাপী বলিয়া জানিতে পারে না, কারণ তাহার পূর্বের সাধুতা-সংস্কার সকলের মনে বর্জ্যমূল হইয়া থাকে, সুতরাং কেহ আমাকে পাপিনী বলিয়া জানিতে পারিল না।

রাত্রি-সমাগমে অন্ধকার হইল। আমি অন্ধকার রাত্রিতেও তাঁহাকে ঘেন দেখিতে পাইলাম। সেইদিন হইতে রাতিতে শুইতে ইত্যাদি সকল সময়ে তিনি আমার মন হইতে সরিলেন না। সেইদিন হইতে আমি তাঁহার প্রকৃত মুখকমল দেখিয়া প্রফুল্ল হইয়া তাবিলাম, তাঁহাতে যেম কোন পাপ নাই, তিনি ঘেন কেবল পুণ্যের আবাসভূমি। সেইদিন হইতে প্রত্যহ বৈকালে তিনি উক্ত বাঁধে বেড়াইতে আসিতেন এবং আমি প্রত্যহ প্রথম দিনের প্রথমত তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। এইসময়ে সর্কজ্ঞান নদীর বাঁধের দিকে আমার মন গড়িয়া রহিল। বাড়ী হইতে বাহির হইলেই আমি অগ্রে নদীর বাঁধের দিকে চাই-তাম। আমার স্বামীর গৃহ পূর্বদিকে ছিল। ঐ গৃহের পূর্বদিকে অনেকগুলি জানালা ছিল। আমি অনেক সময় গৃহমধ্যে বসিয়া জানালা দিয়া বাঁধের দিকে চাহিয়া থাকিতাম, তাঁহাকে না দেখিতে পাইলে নির্জনে কাঁদিতাম। আমার এই প্রণয়াকাজ্ঞাপূর্ণ পাপশূন্য ভাব (তোমার কাছে খপখ করিয়া বলিতেছি, আমার মনে কোন কুভাব ছিল না) দেখিয়া স্বামী স্বাশুভী দেবর প্রকৃতি স্বামিকুলের লোক এবং প্রতি-বেশিগণ আমাকে পাপিনী বলিয়া জানিলেন। তদবধি কুলটা বলিয়া আমি সকলের নিকট ভিন্নভাৱ ও গ্রহাৱের ভাজন হইয়াছি।

স্থিতিশীল বহুসমাজকে ধন্য । কাম ও প্রেমের বাহ্যিক লক্ষণ (যেমন আসক্তলিপ্সা, হাসিমাখান দৃষ্টি) যখন একপ্রকার, তখন আমার ভাবকে একবারে নিশ্চয় কামভাব জানিয়া আমাকে নিয়ত যত্ননা দেয় কেন ? তোমরা যখন আমার রোগের নিদান (কারণ) জান না, তখন তোমাদের ঐপ্রকার চিকিৎসায় কি ফল হইবে ?

ক-নামক রোগের বহুলক্ষণ এবং খ-নামক বোগেরও বহুলক্ষণ । ক-নামক বোগের বাহ্যিক কয়েকটি লক্ষণের সহিত খ-নামক রোগের বাহ্যিক কয়েকটি লক্ষণ মিলিতেছে দেখিয়া যিনি প্রকৃত ক-নামক রোগকে খ-নামক রোগ স্থির করিয়া চিকিৎসা করেন, তিনি রোগীর প্রাণনাশের হেতু হন মাত্র ।

স্বামী দেবব, স্বাস্থ্যভী প্রভৃতি আমার স্বপ্নরকুলের লোকগণ ঐপ্রকার চিকিৎসক । কেন বলি, তাঁহারা আমার প্রেমের কয়েকটি বাহ্যিক লক্ষণের (যে কয়েকটি মাত্র বিকাশ হইয়াছে) সহিত কামের লক্ষণ মিলিয়াছে দেখিয়া আমাকে কাম-পরায়ণা জ্ঞানে তাঁহাদের জ্ঞাত কুপ্রযুক্তিমনোবধ প্রহরাদি দ্বারা চিকিৎসা করিতেছেন । আমার যদি যদার্থ ঐ রোগ হইত, তাহা হইলেও ঐপ্রকার রোগেব ঐপ্রকার চিকিৎসা করা হাতুড়ে চিকিৎসকের লক্ষণ । যাহারা কুইনাইন প্রয়োগ করিয়া বিষম জরকে তাড়াইতে চান, তাঁহাদিগকে আমি হাতুড়ে বলিব না ত আর কি বলিব ? বিষমজরে কুইনাইন প্রয়োগে কুমারের হাড়ী পোড়ানা চুন্নীর (পনের) মত রোগীর শরীরের উপর কিয়দ্দিন অধি থাকে না বটে, কিন্তু ভিতরে প্রবল অগ্নি

প্রজলিত হইয়া মেদ, মাংস, রক্ত, শুক্র প্রভৃতি ধ্বংস করিতে থাকে। যে চিকিৎসায রোগের মূল কারণ ধ্বংস না হয়, তাহা চিকিৎসাই নয়। যদি আমার রোগ সমূলে উৎপাটিত না হইল, তবে তোমার চিকিৎসার প্রশংসা কি? বোগ-নিবারণেব উদ্দেশ্যই চিকিৎসা। স্বামী প্রভৃতির ঐপ্রকার চিকিৎসায় রোগীর দেহ ও মন হইতে রোগ দূর হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহা দ্বারা বোগ সংক্রামক হইয়া পড়ে। তাঁহাদের জানা কর্তব্য, অনেক শারীরিক রোগ যেমন সংক্রামক, কাম প্রভৃতি অনেক মানসিক রোগও সেই-প্রকার সংক্রামক। পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত শাসন প্রভৃতি ঔষধে মানসিক সংক্রামক বোগগুলি অনেককে প্রকল্প-রূপে আক্রমণ করিতে পারে না বটে, কিন্তু তিতরে তিতরে সকলকে আক্রমণ করে, কাবণ ঐ সমস্ত শাসনৌষধ মানসিক সংক্রামক রোগের ব্রহ্মাণ্ড নয়। শুধু, আমি একজন কুলটার ইহকালে পারিবারিক ও সামাজিক শাসন দেখিয়া ও পরকালে ধর্ম-সংক্রান্ত শাসন হইবে ভাবিয়া কুলটাবৃত্তি হইতে নিরস্ত হইতে পারি বটে, কিন্তু কুলটা যে ইন্দ্রিয়চরিতার্থ-তাকে (কামকাঁধ্যকে) সুখ জানিয়া কুলটাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, সেই মিথ্যা সুখসংস্কাররূপ কুরোগ আমার মনে আসিবেই আসিবে। কুলটার ঐহিক দণ্ড দেখিয়া বধেচ্ছাচার করিতে আমি সাহসিনী হইব না বটে কিন্তু গুপ্তভাবে সেই কলিত সংক্রামক সুখ-বোগকে ভোগ করিতে কখনই ছাড়িব না। তজ্জন্ত বলি মানসিক সংক্রামক রোগগুলির প্রাবল্য ঐপ্রকার শাসনৌষধে অনেককে আক্রমণ করিতে পারে না বটে, কিন্তু

মূল রোগ সকলকে আক্রমণ কবে, কাৰণ পারিবারিক সামাজিক পারলৌকিক শাসকেরা কাৰ্য্য দ্বারা এই ঘোষণা করেন, যে চৌর্য্য কামকাৰ্য্য অভক্ষ্যভক্ষণ প্রভৃতি কাৰ্য্যে সূখ আছে বটে, সমাজের অনিষ্ট হয় বলিয়া তাহাদের শাসন আবশ্যক। তাঁহারা রোগের মূলগুলিকে রোগ না বলিয়া ভ্রম-বশতঃ স্বাস্থ্য বলেন বলিয়া ঐ রোগ সগূলে বিনষ্ট না হইয়া সৰ্ব্বক্ষণ অগতে বিবময় ফল প্রসব করিতেছে। যে বৃক্ষ বিষ-ফল প্রসব করে, তাহাকে সুধাবৃক্ষ বলিয়া ঘোষণা করা অজ্ঞতার পরিচায়ক। পূৰ্বে বলিয়াছি, শাসকেরা রোগকে সুখ বলেন বলিয়া রোগ যায় না, কারণ মানব সব ছাড়িতে পাবে, কিন্তু সুখ ছাড়িতে পাবে না। এই অজ্ঞ শাস্ত্রকারদের, পরিবারের ও সমাজের শাসনোপায়ে রোগের মূল নাশ হইতেছে না। এই চক্ৰই বোগতক সময়ে সময়ে শাখা ও প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিষফল প্রসব করিতেছে।

সুহৃদ, আপনি বলিতে পারেন “বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোকেও কি সুখ ছাড়িতে পারেন না? অবশ্য পারেন, তবে মানবমাত্রেই সুখ ছাড়িতে পারে না এ কথা বলা অসম্ভার।”

আমি বলি, কেহ কেহ (তাঁহাদের সংখ্যা খুব অল্প) কোন কোন সুখ ছাড়েন বটে, কিন্তু তাঁহারা পরিত্যক্ত সুখকে মন্দ বলিয়া তৎপরিবর্তে উৎকৃষ্ট সুখকে আশ্রয় করেন। উৎকৃষ্ট সুখের নিকট পরিত্যক্ত মন্দ সুখ হুঃখে পরিণত হয় বলিয়া তাঁহারা তাহা ছাড়িতে পারেন, নতুবা সুখ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে কখনই ছাড়িতে পারিতেন না। তাই বলি, কেহ কখন সুখ ছাড়িতে পারেন না।

ভাই । বাহার কার্য মন্দ, তাহার কারণও যেমন তাহা নিশ্চয় ; কুকার্যের প্রাবল্য যখন সমাজের মন্দ, তখন কুকার্যের কারণ কুপ্রবৃত্তিও মন্দ । বাহ্যিক ইঞ্জিয়ার প্রাবল্য নিবারণ করিয়া সমাজের ইষ্ট করিতে চান, কিন্তু ইঞ্জিয়ারবৃত্তিকে হুৎ জ্ঞান করেন, তাহাদিগকে আমি কুপ্রবৃত্তি ও তাহার চরিতার্থতাকে হুৎ না হুৎ ইহা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি । তাহা পরীক্ষায় অবশ্য হুৎ বলিয়া সিদ্ধ হইবে । তাহারা যখন আমার কথা বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং তাহাকে পরীক্ষা করিয়া হুৎ বলিবেন, তখন “কুপ্রবৃত্তিগুলি যে হুৎ” এই সত্য জাগ্রত ভাবে তাঁহাদের মনে প্রতিভাত হইবে, এবং তখন তাঁহারা তৎপ্রভাবে নব জীবন পাইয়া নিদ্রিত জগৎকে জাগ্রত করিতে পারিবেন । নিজে জীবন্ত সত্য পাইয়া জীবন্ত ভাব না ধবিলে অস্ত্র কাহাকে জীবন্ত ভাব ধারণ করাইতে পারা যায় না । মন্দা-বন্দা-জনিত-চিত্তার উদ্রেকে জীবন্ত সত্য পাইয়াছি বলিয়া আমি তোমাকে তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না । আমাদের ইচ্ছা এই যে, আমি চিন্তালব্ধ জীবন্ত সত্যগুলিকে জগতে দিবানিশি ঘোষণা কবি । অবলা স্ত্রীজাতি বলিয়া তুমি আমাকে ঘৃণা না কর আমার এই তিক্কা ।

ভাই । তুমি বলিতে পার, আপনাত্মক কথিত জ্ঞানের বিরুদ্ধে তুমি কাণ্ড করিতেছ, কারণ তুমি এই বলিলে, “এক প্রবৃত্তির বাহ্যিক কতক লক্ষণের সহিত অস্ত্র প্রবৃত্তির বাহ্যিক কতক লক্ষণ মিলিলে অর্থাৎ কতক বাহ্যিক লক্ষণে এক হইয়া দুই-প্রকার প্রবৃত্তির পরিচয় দিলে তাহা কোন্ প্রবৃত্তি স্থির করা যায় না । প্রহরাদি পরপুরুষের সহিত প্রণয়ের অস্ত্রও ঘটতে

পারে, আর সুকার্যের অস্তিত্ব ঘটিতে পারে, তবে ভোরীকে কামপবারণা ভাবিয়া তাঁহারা মারিলেন, ইহা কি করিয়া জানিলে ?

ভাই! আমি স্বকর্ণে শুনিয়া ইহা লিখিতেছি। অনুমান-বিভ্রাটে (হুই বা ততোধিক কারণে এককার্য্য প্রসব করে বলিয়া অনুমান-বিভ্রাট ঘটে; যেমন প্রের ও কাম এই হুই কারণে অনুরাগোৎপত্তি হ'ব বলিয়া অনুমান-বিভ্রাট) আমি প্রাণান্তে না বেধিয়া সিদ্ধান্ত কবি না। বিভ্রাট-অনুমানের যে ফল আমি পাইবাহি তাহা এসংসারে অল্প কেহ পাইয়াছে কি না সন্দেহ। এজন্ত আমাব ইচ্ছা এই যে আপনকে ভুল করিয়া ঐ পাপ সিদ্ধান্ত করিবার কাবণকে জগৎ হইতে তাড়াইয়া দিই। যে কারণ একইপ্রকার কার্য্যের পরিচয় দেয়, হুই বা ততোধিক কার্য্যের পরিচয় দেয় না (যেমন গর্ভেতে বৃষ্টি নদীতে বণ্যার একমাত্র কাবণ) আমি সেইপ্রকার অনুমানের সিদ্ধান্ত করিতে সকলকে অনুরোধ করি। ইহা আর কিছুই নয়, প্রত্যক্ষের ফলমাত্র, অথবা সম্পূর্ণ সত্যের একাংশোদ্ধৃত বা প্রত্যক্ষের একাংশোদ্ধৃত। আমি শেবে যে সমস্ত বলিলাম, সে সমস্ত দেখাইতে চেষ্টা করিম।

১ম। অনুমান প্রত্যক্ষের ফল কি না? আকাশে চন্দ্রোদয় হইলেই আমরা পৃথিবীকে শুভ্রালোকে দীপ্ত হইতে দেখি। চন্দ্রের দীপ্ত কার্য্য ছুরোজুরো প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়া জগৎকে শুভ্রালোকে আলোকিত হইতে দেখিলেই চন্দ্রকে আকাশে না দেখিয়াও দেখিতে পাই, সুতরাং অনুমান প্রত্যক্ষের ফল ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

২য়। অনুমান সত্যের একাংশোদ্ধৃত কি না? আকাশে যে শুভ্র চন্দ্র উঠে, তাহা গোল। আকাশে চন্দ্র উঠিলে জগৎ শুভ্রালোকে আলোকিত হয়, এবং সমুদ্রের জল ক্ষীত হয়। ইত্যাদি চন্দ্রসম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ সত্যটি প্রত্যক্ষ হয়। চন্দ্রসম্বন্ধীয় কার্য্য প্রভৃতি চন্দ্র-সত্যের অন্তর্গত। বস্তুমাত্রই এক একটা 'সত্য' অর্থাৎ একটা বস্তুর গুণ কার্য্য ইত্যাদি। জগৎ জ্যোৎস্না-লোকে আলোকিত হওয়া ঐ চন্দ্রসত্যের একাংশ। সুতরাং ঐ প্রকার অনুমান, সত্যের একাংশ ও একাংশোদ্ধৃত না হইবে কেন?

৩য়। ঐ চন্দ্রসত্য আমাদের প্রত্যক্ষেরও একাংশোদ্ধৃত। আমরা বহুবার তাহার সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিবাছি, এখন কেবল জগৎকে আলোকিত করা কার্য্য দেখিয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষের একাংশ দেখিয়া তাহাকে দেখিতে পাইতেছি। বন্ধুকে বারংবার প্রত্যক্ষ করি বলিয়া তাহার রূপ প্রত্যক্ষ করিলে এই একাংশ অবশ্য প্রত্যক্ষ দ্বারা তাহাকে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ কবি, সুতরাং ঐ অনুমান সত্যেরও প্রত্যক্ষের একাংশ ও একাংশোদ্ধৃত না হইবে কেন? আমি ঐ প্রকার অনুমানকে ছয়প্রকার প্রত্যক্ষের (দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আত্মকন ও মানস) মধ্যে ধরিয়া লই। অনিশ্চিত অনুমান (যেমন মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান) কখন কখন সত্য হইলেও সর্ব্ব সময়ে সত্য হয় না। এজন্য ঐ অনুমানকে আমি প্রত্যক্ষ অনুমানের মধ্যে ধরিব না। প্রত্যক্ষ করি নাই, অথচ আপনার দর্শন বিষয় দেখিয়া যে অনুমান (যেমন পরকালের অনুমান অর্থাৎ আমরা বেহানে বাই সেই ঘানে বাসস্থান দেখি, এই দর্শন কারণে পরকাল না

দেখিয়াও পবকালের বে অনুমান) তাহাকে আমি মহাভ্রম জ্ঞান করি। এই দৃষ্টমানপ্রকৃতি ব্যতীত আমাদের জ্ঞানলাভের উপায় আর কি আছে? সুতরাং আমরা পবকাল সৃষ্টি করি কোন্ হিসাবে? চন্দ্রমণ্ডলে জীব এইপ্রকৃতি জীবের মত হইবে, এই অনুমান বেক্রপ ভ্রম, সেইপ্রকার ইহকাল আছে বলিয়া পবকালের অনুমানও সেইপ্রকার ভ্রম। অস্তঃপুর-চিববন্ধা রমণীব “পৃথিবীর সকলস্থান স্থলময়” এই অনুমান বেক্রপ ভ্রম, পবকালের অনুমানও সেইরূপ ভ্রম হইতে পারে, কারণ না দেখিয়া অনুমান করিলে ঐরূপ ভ্রম ঘটে। সুতরাং আমরা কোন বস্তু না দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিব না, এবং সিদ্ধান্ত করিতে স্বপ্নেও চেষ্টা করিব না। বাহা দেখি নাই, আজীবন চেষ্টা করিলেও দেখিতে পাইব না, তাহা দেখাব ছাং সিদ্ধান্ত কঁবা বাতুলতামাত্র, কিন্তু হুঃখের বিষয় “বাহা দেখিতে পাইব না তাহার চেষ্টা করা মিথ্যা” এই ভাব অনেকের মনে আইসে না বলিয়া অনেককে উক্তপ্রকার বায়ুরোগ আক্রমণ কবে। নিষ্কল-চিন্তা-বায়ুবোগে (যেমন পবকাল কি? “তৈলাবার পাত্র, না পাত্রাবার তৈল” ইত্যাদি নিষ্কল-চিন্তা-বায়ুবোগে) অনেক পণ্ডিতমণ্ডলী অক্রান্ত হইয়াছিলেন। এইজন্ত তাঁহারা এত চিন্তা করিয়াও জগতের ইহলোকোন্নতি (বাহা ভিন্ন অল্প উন্নতি স্বীকার করা বাতুলতা) কবিয়া বাইতে পারেন নাই। বহু পণ্ডিত নিষ্কল চিন্তারূপ বায়ুরোগে আক্রান্ত হন না বলিয়া অল্পচিন্তাতেও ইহকালের সৰ্ব্ববিধোন্নতি সাধন করিয়াছেন ও কবিতেছেন। আমি জানি, যিনি যতপরিমাণে প্রকৃত জ্ঞান অধিকার করিয়াছেন, তিনি

ততপরিমাণে মহান্ ও তাঁহার জীবন ততপরিমাণে আলোকময় ।
 মিলের পার্শ্বে কণাককে, কমটের পার্শ্বে কপিলকে ইত্যাদিকে
 বসাইলে কাহাকে মহান্ জ্ঞান হয় ? কাহার জীবন অধিক
 আলোকময় ? যিনি মহান্ হইবেন এবং যাঁহার জীবন বহু-
 পরিমাণে আলোকময়, তিনি ততপরিমাণে নিশ্চয় প্রকৃত
 জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানলাভ করিয়াছেন । যদি সর্বশ্রেষ্ঠ
 মিথ্যাকল্পনাকারীকে হুতরাং নিষ্কল-চিন্তা-কারীকে মহান্ বলিয়া
 ছিন্ন কর, তাহা হইলে, বাস্তবেরা মহান্ হইতে পারে । যাঁহার
 প্রকৃত মঙ্গল-চিন্তা না করেন, তাঁহার বিবেচ-চিন্তা-শীল হইলেও
 আমি তাঁহাদিগকে মহান্ শব্দে অভিহিত করিতে লজ্জিত
 হই । আমি জানি, সম্মানহৃৎক বৈশ্বকগুলি ঈশ্বরতুল্য উপকারী
 ব্যক্তিবিশেষের জন্ত হুঁট হইয়াছে, অপকারীদিগের (যাহাবা
 আপনার জীবনের হুঁটান্তে বা অজ্ঞ কোন উপায়ে
 জনতের অপকার করে) তাহাদের জন্ত নীচশব্দ হুঁট
 হইয়াছে ।

যে অনুমান-বিজ্ঞাটে হু আর হু আছে, (যেমন হুরোপ,
 হুরোপ-নিবারণের চেষ্টা করিলে রোগী ভালও হয়, এবং
 রোগীর মৃত্যুও ঘটে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করি, হুতরাং হুরোপ-
 জ্ঞাত রোগী দেখিলে যে একটা হু আর হুর অনুমান-বিজ্ঞাট
 ঘটে) সেই অনুমান-বিজ্ঞাটে হু অবলম্বন করা উচিত,
 কারণ হু (মঙ্গলাশ) থাকিতে নিশ্চেষ্ট হওয়া মহাপাপ । আমার
 মত এই যে, হুতাবকে হুতাব সিদ্ধান্ত করা যেমন মহাপাপ,
 উহা সেইপ্রকার মহাপাপ । আমার হুতাব, হুতাব সিদ্ধান্ত
 হইয়াছে বলিয়া অর্থাৎ জনতের অনিষ্টকর বলিয়া যে কারণে

মহাপাপ বলিয়াছি, ঐপ্রকার হু আশা থাকিতে নিশ্চেষ্ট হও-
রাকে সেই কারণে মহাপাপ বলিতেছি।

তাই। ঈশ্বর ও পরকালাদির অনুমানসম্বন্ধে আমার মত
পাঠ করিয়া তুমি আমাকে নাস্তিকশিষ্য ভাবিবে। আমি
যখন ঈশ্বর-পরকালাদি-সম্বন্ধে কোন তর্ক উপস্থিত করি
নাই, কেবল জগতের ইষ্ট ও অনিষ্টের দিকে লক্ষ্য করিয়া পত্র
লিখিতেছি, তখন স্বাভাবিক জ্ঞানী ব্যক্তির উহা তাবা উচিত
নয়। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, কি কারণে আমি ঐ অনু-
মানের উপর বড় গুরুত্ব হইয়াছি।

লোকদিগকে স্বপ্রকৃতি অনুসারে ও নিজ-নিজ-বর্ণন-
জ্ঞানানুসারে অনুমানবলে ঈশ্বর ও পরকালাদি স্বজন করিয়া
পবম্পর বিভ্রাণ্ডা ও প্রাণনাশ করিতে দেখিয়া আমি ঐ অনু-
মানের উপর বড় গুরুত্ব হইয়াছি। দেখ, মুসলমানেরা
স্বপ্রকৃতি অনুসারে (মুসলমান ও হিন্দু প্রভৃতির মূল প্রকৃতি
এক, কিন্তু অজ্ঞানের ও শিকার অস্ত্র যে বিভিন্নতা তাহা
এস্থলে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা অনাবশ্যক) ও বর্ণন-জ্ঞান-
ানুসারে একপ্রকার, হিন্দুরা স্বপ্রকৃতি ও বর্ণন-জ্ঞানানুসারে
আর একপ্রকার এবং বৃষ্টান প্রভৃতি অস্ত্রান্তপ্রকার পরকালাদি
স্বজন করিয়াছে। এই বিভিন্নতার কারণে অর্থাৎ ঐ অনুমানের
বৈদ্যবাক্যে, হিন্দু, মুসলমান, বৃষ্টান ইত্যাদি জাতির মধ্যে
কত বিভ্রাণ্ডা ও হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে। যাহারা
ঐপ্রকার অনুমান করিতে ইচ্ছুক নহেন (যেমন বৌদ্ধ প্রভৃতি
ঐক্যবাদী) তাহারাও বিনা দোষে ঐপ্রকার অনুমানবাদী-
দের নিকট বিনা কারণে নানাপ্রকার দণ্ড পাইয়াছেন

ও পাইতেছেন। ঐ প্রকার অনুমান বাহারা করেন, তাঁহাদের নিস্তার নাই এবং বাহারা না করেন, তাঁহাদেরও নিস্তার নাই। ঐ অনুমানের অসংখ্য দোষ। পরকালাদি মানবের অজ্ঞাত বিষয় বলিয়া আমি জ্ঞাত রহিলাম; ইহাতে ঐ অনুমান-বাদীরা আমাকে পীড়ন করেন কেন? আর আমার অনুমানের সহিত তোমার অনুমান মিলিবে না, কারণ তুমিও দেখ নাই আমিও দেখি নাই, তবে আমরা পরস্পর বিতণ্ডা ও মারামারি করি কেন? তাই বলি, ঐ অনুমানের অসংখ্য দোষ। ঐ প্রকার অনুমানবাদীরা বড় উৎপীড়ন করুক, আমি সত্যপথ কখনই ছাড়িব না; কারণ সত্যই (মনের আলোক) মানবের একমাত্র সুখ এবং অসত্যই (মনের অন্ধকার) মানবের দুঃখ। মানসিক সুখ সর্বসুখসার। ঐ সুখের নিকট অস্ত্র সুখ, দুঃখ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং ঐ সুখের আশ্রয় নইলে কোন দুঃখই আক্রমণ করিতে পারে না। আমার বিশ্বাস, অগতে বড় শিক্ষার বিস্তার হইবে, তত ঐ অনুমানের প্রেকোপ করিয়া বাইতেই পারে, তত বেশমূলত অজ্ঞানতার প্রভা কমিয়া বাইয়া মানবমাত্রই একপ্রকৃতি হইবে। জ্ঞানবিস্তারে যখন শিক্ষিত মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দু প্রভৃতির একপ্রকৃতি হইতেছে তখন জ্ঞানবিস্তারে সকলে একজাতি না হইবে কেন?

বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়া বোধ হয় জ্ঞানমাত্রই অবিস্মৃতিত। আমি মূর্খ ত্রীলোক হইয়াও মন্দ অবস্থায় পড়িয়া অর্থাৎ অনুমান-বিভ্রাটে লাঞ্ছনা পাইয়া কোন্ অনুমান ভাল, কোন্ অনুমান মন্দ ইত্যাদি বিষয় বিদ্যানেজে দেখিয়া তোমাকে জানীর

মত বলিতে সাহসিনী হইয়াছি। এই কারণে বলিতে ইচ্ছা হয়, জ্ঞান অবস্থা-জনিত। যিনি হুঃখের অবস্থায় পড়িয়া থাকেন, তিনি হুঃখ ও হুঃখনিবারণের জ্ঞান সুতরাং সুখজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত আমারই কাছে, তাহা তোমাকে জানান গিয়াছে, সুতরাং আর বলিতে হইবে না। বোধ হয়, বাহার হুঃখের অবস্থা, তিনিও সুখবিষয়জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। অবস্থায় থাকিয়াও জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না কেন? আমার হুঃখের অবস্থা নয়, সুতরাং ঐ বিষয়ে আমি অধিক বলিতে পারিব না।

তুমি বলিতে পার, বাহার হুঃখের অবস্থা, সে কি করিয়া সুখ-জ্ঞানলাভ করিবে? সুখভুক্তোভোগী না হইলে সুখ জানিবে কি প্রকারে?

মানবের জীবনটী সুখদ্বারা নির্মিত। মানব হইয়াই সুখ ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং আপনার প্রকৃত অবস্থায় বিরুদ্ধকে হুঃখ বলিয়া জ্ঞান করে, এবং প্রকৃত অবস্থাতে থাকাকে সুখজ্ঞান করিয়া থাকে। দেখ, পূর্বের সহজাবস্থায় অনুমান-বিভ্রাটে কষ্ট পাই নাই ও সুখভোগ করিয়াছি বলিয়া এখন অনুমান-বিভ্রাটে কষ্ট পাইয়া হুঃখ জ্ঞান করিয়াছি, সুতরাং পূর্বের সহজাবস্থাকে সুখ বলিয়া জানিতেছি। মানবের সুখ-নির্মিত জীবনের দিবানিশি ক্ষয় হইতেছে ও সুখ না হইলে তাহার পূরণ হয় না বলিয়া সর্বজনীন মানব সুখ খুঁজিতেছে। এইজন্য তাহাকে হুঃখও আলিঙ্গন করিতে হইয়াছে। বাহা জীবনের সহিত মিশিয়া জীবনকে সুখ দিতেছে, তাহাকে মানব সুখ ও বাহা জীবন ক্ষয় করিতেছে, তাহাকে হুঃখ বলিয়া জানিতেছে। এই কারণে মানব, সুখ ও হুঃখ জানে। মানবের

জীবন সধময় বলিয়া হুঃখ পাইয়া সুখ জানিতে পারে। বলা আবশ্যক সুখ-হুঃখ-জ্ঞান মানবের ভ্রম হইলেও হইতে পারে, কারণ মানবকে ভ্রম সর্বক্ষণ আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে। আমি মন্দ অবস্থায় পড়িয়া যে কয়েকটা জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তাহা তুমি প্রচার করিবে, এই আশার তোমার নিকট লিখিয়া পাঠাইতেছি। তুমি আমাকে স্বর্থ স্ত্রীলোক বলিয়া ঘৃণা করিও না।

ভাই। হুঃখ পাইয়া আমার মনে পরোপকারিণী বৃত্তি-দেবীর উদ্ভব হইয়াছে। বোধ হয়, উহা সকলেরই হইয়া থাকে। আশা করি, আমাকে সামান্যজ্ঞানে ঘৃণা কবিয়া যেন জগদীশ্বরী পরোপকারিণী দেবীকে ঘৃণা না কর।

সুখের জন্ত মন্দ অবস্থায় পড়িয়াও বিবিধ জ্ঞানসুখ লাভ কবিয়া আমার বলিতে ইচ্ছা হয় যে, সকলে যেন পরোপকার-বৃত্তি বা প্রকৃতসুখাবেষণবৃত্তিতে চালিত হয়, কাবণ পরোপকার বা সুখাবেষণ বৃত্তিহীন আপনার ও জগতের সুখবৃদ্ধির ও হুঃখনিবারণের লালসায় মানবকে নানা অবস্থায় ফেলিয়া সুখ ও হুঃখ সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞান লাভ করাইয়া মানবকে স্বর্গে পৌঁছাইয়া দেয়। ঐ দুই বৃত্তি মানবের সমস্ত মঙ্গল-দায়ক জ্ঞান লাভ করাইতে পারে, জ্ঞানেই মানবের স্ফূর্তি। জগৎকে জানাইবার জন্ত বাহ্যিক সুখ-হুঃখ-জ্ঞানবিষয় উদ্দেশ্য নাই, এবং আপনার প্রকৃত সুখের জন্ত ও আপনাকে প্রকৃত হুঃখের হাত হইতে এড়াইবার জন্ত বাহ্যিক প্রকৃত সুখ-হুঃখের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য নাই, তাহার ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি হ্রাস হয়, সুতরাং চিন্তা-শক্তির হ্রাস

হয়। এই কারণে জ্ঞানলাভের প্রকৃতোপায় অবস্থার পড়িয়াও সে জ্ঞানলাভ করিতে পারে না ।

বাক্যের সহিত অর্থের সম্বন্ধের মত সকলপ্রকার জ্ঞানের সহিত সুখের সম্বন্ধ আছে। পরোপকার ও প্রকৃতসুখাশ্বেষণ বৃত্তিযুক্ত বিজ্ঞান-চিন্তকের, প্রেমিকের, ইত্যাদি নানাবস্থায় মানবকে কেলাইয়া বিবিধ জ্ঞান লাভ করাইয়া দেয়, সুতরাং সুখও আনিয়া দেয়। এই কারণে আমি ঐ বৃত্তিযুগ্মের মধ্যে কোন একটি বৃত্তিতে চালিত হইতে সকলকে অনুরোধ করি। দেব ভাই, মহাত্মা রামমোহন রায় প্রভৃতি পরোপকারবৃত্তিতে চালিত হইয়া কতপ্রকার অবস্থায় পড়িয়া কতপ্রকার জ্ঞানসুখ লাভ করিয়া মহানু হইয়াছিলেন। বেধ, দেবগুরু বৃহস্পতি ও মহাত্মা জনস্ট্রুয়ার্টমিল প্রভৃতি সুখাশ্বেষণবৃত্তিতে চালিত হইয়া কতপ্রকার জ্ঞানসুখ লাভ করিয়া সুখী ও মহানু হইয়াছিলেন। সুখাশ্বেষণবৃত্তি যে পরোপকারবৃত্তিকে আনিয়া দেয়, এবং পরোপকারবৃত্তির নাম যে সুখ, মিল তাহার প্রমাণ। সুখাশ্বেষণ-বৃত্তি-চালিত মিলের মানসিক সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন “আমি আত্মসুখের জন্ত চেষ্টা ও কার্য্য করে, তাহার কখনই সুখী হইতে পারে না, নিজের সুখের জন্ত চিরকাল অশ্বেষণ কর, কখনই সুখ পাইবে না, পরের হৃৎকনিবারণের ও সুখবর্জনের চেষ্টা ও কার্য্য কর, সুখ আপনা হইতে আসিবে।” এই কথাতে প্রকাশ হইয়াছে আত্মসুখাশ্বেষণ-বৃত্তি পরোপকার-বৃত্তিকে আনিয়া দেয়, ও পরোপকারবৃত্তির অপর নাম সুখ ।

পরোপকার-বৃত্তি নিজে বিজ্ঞানচর্চা করে ও তাহা করিতে

অন্তকে উপদেশ দেয়, কারণ বিজ্ঞানচর্চা সুখ। বাহ্য সুখ, পরোপকারবৃত্তিকে তাহা অপরকে দিতে হয়। নিজে সুখান্বিত না করিলে অন্তকে তাহা দিতে পারে না। এই কারণে পরোপকার বৃত্তিকে বিজ্ঞানচর্চা প্রভৃতি সুখ ভোগ কবিতো হয়। ফলতঃ পরোপকার-বৃত্তির সহিত মানবের সমস্ত মঙ্গল পদার্থের সম্বন্ধ আছে। সুখাশেষণ-বৃত্তিও শেষে যে পরোপকারবৃত্তিতে পরিণত হয়, মিল তাহার প্রমাণ। আমি এই সকল কাবণে ঐ দুই বৃত্তির মধ্যে কোন একটা বৃত্তিতে চালিত হইতে সকলে অনু-রোধ কবি।

তাই। একদিন আমি শান্তডী ঠাকুরাণীর পায়ে ধরিয়া বলিলাম, ঠাকুরাণি! আমাকে কেন যন্ত্রণা দেন? আপনি আমাকে যে পাপে পাপিনী ভাবিয়া যন্ত্রণা দিতেছেন, আমি সে পাপে পাপিনী নহি। ভাসুর স্বামী দেবর প্রভৃতি অধুনাতন লোকেরা প্রণয়নামক ঈশ্বর জানেন, কেবল তাঁহাদের দোষ এই যে, তাঁহারা এক সু-বৃত্তির লক্ষণের সহিত অল্প কু-বৃত্তির লক্ষণের সাদৃশ্য দেখিয়া পুণ্যকে পাপ জ্ঞান করিয়া আমাকে যন্ত্রণা দিতেছেন। কিন্তু শান্তডী ঠাকুরাণী সে কালের লোক, দাম্পত্য-প্রেম জানিবেন কি প্রকারে? সত্যের অনুবোধে বলিতে হইতেছে, নিঃস্বার্থ দাম্পত্য-প্রেম যে কি পদার্থ, তাহা .সেকালের লোকের জানা দূরে থাকুক, সহস্র সহস্র বার বলিলেও তাহা তাঁহারা মনে ধারণাও কবিতো পারেন না। নিঃস্বার্থ প্রেমের সাধু উদ্দেশ্যে স্ত্রী পুরুষের সহিত, পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলে, তাঁহারা তাহাদ্বিগকে পাপ-কার্য্য-করণোদ্দেশ্যে মিলিত বলিয়া স্থির করেন। স্বার্থ দাম্পত্য-প্রেমে

কামের ধ্বংস হয়, শুদ্ধ কাম কেন, সমস্ত পাপই জগতের নিকট না হউক, স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের নিকটে ধ্বংস হয়। আমি যীহার সহিত প্রণয় করিয়াছি, তাঁহার অনিষ্টচিন্তা, অনিষ্ট কার্য ও তৎসহ পাপবৃত্তি চবিত্তার্থ করিব না এবং তিনিও করিবেন না, যদি করি, তবে নিঃস্বার্থ দাম্পত্য-প্রেম হইবে না। অতএব পাপকে বলি না দিলে চলিবে না। কিন্তু সেকালের লোক দাম্পত্যের পরে প্রেম থাকিতেও দাম্পত্য-প্রেমকে পাপেব আধার বলিয়া জানে, সেই জন্য আমার এত লাহুনা। সেকালের লোক দাম্পত্য-প্রেমকে কুভাব মনে করে এবং সেদিকে তাহাদের অধিক ঝুঁকু এই দুই কাবণে বেদান্ত-দর্শনপ্রণেতা স্বীয়-সিদ্ধান্তানুসারে কপিলের জ্ঞান প্রকৃতিকে জগতের মূল না বলিয়া প্রকৃতি ও প্রকৃতির স্বামী ঈশ্বর এই দুই জনকে জগতের মূল বলিয়া প্রকৃতিকে রাখা ও প্রকৃতিব স্বামী পুরুষকে কৃষ্ণ করিয়া কাব্যাকাবে অশঙ্কভাবে রচনা করিয়াছেন। যদি তাহা (সেকালের লোকে) দাম্পত্য-প্রেমকে ভাল বলিয়া জানিত এবং সেদিকেই তাহাদিগেব অধিক ঝুঁকু না থাকিত, তাহা হইলে, তাঁহাকে (ব্যাসকে) এমন নীচকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইত না। তিনি সৰ্ব্বসাধারণের নিকট আপন মত প্রকাশ করিবেন বলিয়া যে নীচ উপদ্রাবলম্বন করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি সদ্ভদ্রেক্ষে চালিত হইয়াও নীচ উপায় অবলম্বন করিয়া সাধারণের মহানিষ্ট করিয়াছেন ও এখন পর্য্যন্তও করিতেছেন। যতদিন না তাঁহার সম্ভাব সকলে বুঝিবে, ততদিন তিনি মহানিষ্ট করিবেন। তাঁহার কৃষ্ণ-বারিকা

ভারতবাসীর বিশেষতঃ অধিকাংশ বঙ্গবাসীর ঈশ্বর ও ঈশ্বরী । এই কারণে ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসী তাঁহার কৃষ্ণ-রাধিকার চরিত্র ত্রাত্রিদিন আলোচনা করিতেছে । ব্যাক্রায়, থিয়েটারে, কীৰ্ত্তনে, সাধারণ গানে ইত্যাদিতে সৰ্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-রাধিকার উচ্চ চরিত্র সাধারণের নেত্রে নীচভাবে প্রকাশ হইতেছে । পুরাণ, কাব্য, নাটক ইত্যাদি কত কত গ্রন্থে কৃষ্ণ-রাধিকার সাধু চরিত্র, নীচভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বঙ্গবাসীরা অব্যাপি অধঃপাতে বাইতেছে । নিদ্রাপতি, চণ্ডীদাস, যদুনাথ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণবপন্থরচয়িতারা ব্যাসের উচ্চ ভাবকে জঘন্ত ভাব মনে করিয়া অসংখ্য পদ রচনা করিয়াছেন । তাঁহাদের রচনার মুগ্ধ হইয়া বঙ্গবাসীরা তাহা দিবানিশি পাঠ করিতেছে । সেই সমস্ত পদ মধুর-রাগ-রাগিণীযুক্ত হইবার কাবণ দিবানিশি গায়কগণ তাহা গাইয়া । সৰ্ব্বক্ষণ বঙ্গবাসীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দিতেছে । তবে কেননা বঙ্গবাসীর চরিত্র কৃষ্ণ-রাধিকার আপত্যতঃ প্রতীক নীচচরিত্রের স্মারক হইবে ?

দেখা যায়, উপাস্ত দেব বা দেবীর মানবীক-চরিত্রাধুসারে (মানবীক উপলানে বাহা গঠিত) উপাসকের চরিত্র হইয়া থাকে, ভক্তিভাজন রামচন্দ্রের মানবীক-চরিত্রাধুসারে রামোপাসকেরও চরিত্র হয় । কুশক্তি-উপাসক শাক্তদের চরিত্র কুশক্তি কালীর স্মারক নিষ্ঠুর হইয়া থাকে । তবে কৃষ্ণ-রাধিকার ভক্তদেরও চরিত্র জঘন্ত না হইবে কেন ? এই কারণেই বৈষ্ণব বৈষ্ণবী প্রভৃতি (বাহারা স্বার্থ কৃষ্ণ-রাধিকার ভক্ত) সম্পূর্ণ কামদাস বা দাসী হইয়া থাকে ।

সাধারণ-অপেক্ষা কবিগণ অতি উচ্চ স্তরের লোক। সে কালের কবিগণ যখন দাম্পত্য-প্রেমকে কুতাব দিয়া আঁকিয়া-ছেন, তখন সর্বসাধারণ যে নিঃস্বার্থ দাম্পত্য-প্রেম বস্তুটি জানিত না, এবং স্ত্রী-পুরুষের মিলনকে পাপ ভাব বলিয়া জানিত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সেকালের শিক্ষিত লোক এবং আজ কালের লোক হইয়াও বাহারা পূর্ব রীতি নীতি ইত্যাদি শিক্ষার শিক্ষিত, সুতরাং একালের হইলেও বাহারা সেকালে লোক, তাহারা ঐ ভাবটী কল্পনার দ্বারা করিতেও পারে না। কিন্তু অতি সুখের বিষয় যে, আজ কালের শিক্ষিত লোকেরা বিশেষতঃ আধুনিক কবিরা ঐ সুন্দর পদার্থের বশো-বোধনা করিয়া যুবক-যুবতীদিগকে পূর্বের দাম্পত্য-প্রেম নরক হইতে পান্ডিত্য দাম্পত্য-প্রেম স্বর্গে তুলিতেছেন; কিন্তু সেকালের রীতিনীতিজ্ঞ লোকদিগের কিছুই করিতে পারেন না; কারণ তাহারা ঐ ভাব স্বপ্নেও মনে ধারণ করিতে পারে না। শান্তডী, ঠাকুরাণী সেকালে লোক। আমি পাপিনী নই বলিয়া অসংখ্য-বার বলিলেও তিনি কিছুতেই তাহা বুঝিলেন না। তাঁহার পদতলে বসিয়া নিঃস্বার্থ দাম্পত্য-প্রেমের গুণ গাইয়া গাইয়া আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, তথাপি তিনি শুনিয়াও বুঝিতে পারিলেন না এবং বিরক্ত হইয়া অবশেষে একদিন আমাকে পদাঘাত করিলেন।

শান্তডী ঠাকুরাণীকে অসংখ্যবার বুকাইলেও তিনি বুঝিলেন না যেহিঁয়া আমার এই জ্ঞানের উদয় হইয়াছে যে মানব-জগৎ হইতে অজ্ঞান ও কুসংস্কার তাড়াইতে হইলে অগ্রে যে অজ্ঞান, অজ্ঞান-জড়িত মানব-জীবনের স্বাধীন-চিন্তা-শক্তিকে আচ্ছন্ন

করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে মন হইতে দূরীভূত করিয়া স্বাধীন-চিন্তা-শক্তির উদ্রেক করা কৰ্ত্তব্য । স্বাধীন-চিন্তা-শক্তির উদয় হইলে মন ক্রমশঃ মহৎ হইবে ; মন মহৎ হইলে হৃৎকায় মহাচেতাকে মহাক্ষা বলিলে মহৎ মনের প্রশস্ত বিচারস্থানে, বিচার্য্য মহাবিশ্ব বাণিয়া বিচার করিয়া পরীক্ষা-পূৰ্ণক গ্রহণ করিতে পারিবে । আমি বাহা বলিলাম, ইহার প্রমাণ জগতে স্বাধীন-চেতার নিকট রহিয়াছে, অল্প প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই । হায় ! আমারও জীবনযটিত ঐ জ্ঞানসৰ্ব্বত্র বিস্তার হইতে আমি কবে দেখিব ? বদেশহিতৈষিবর্গ আমার এই বাহা পূর্ণ করিতে পারেন । এই অল্প আমি তাঁহাদিগকে এই অমুরোধ করি যে, অগ্রে তাঁহারা শিক্ষা দ্বারা অজ্ঞান-কুল-স্তরাপন্ন মানবদিগের আচ্ছন্ন-স্বাধীন-চিন্তা-শক্তি অজ্ঞান দূরীভূত করিয়া হৃৎকায় তাহাদের মনের কতকাংশ প্রশস্ত করিয়া তাহাতে স্বাধীন-চিন্তা-শক্তির উদ্রেক করিয়া দিয়া তৎপরে স্বীয় স্বীয় জগতের মঙ্গলময় সত্যগুলি, বাহারা স্বাধীন-চিন্তা শক্তি পাইল, তাহাদের নিকট উপস্থিত করেন । তাহা হইলে সত্যের রাজ্য (বাহারা স্বাধীন-চিন্তা-শক্তি পাইল) তাহাদের নিকট প্রতিষ্ঠিত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না । অজ্ঞান ব্যক্তিদের নিকট মহৎ সত্যগুলি সহজ সহজ বৎসর স্থাপনের চেষ্টা করিলে তাহা কখনই স্থাপিত হইবে না, বহি হই, দুৰ্ব্বদের নিকট চৈতন্তের প্রেম সত্য-স্থাপনের স্তায় কামের নাম প্রেম যেমন হইয়াছে, সেইপ্রকার হইবে, এবং চৈতন্তের প্রেমের উপাসনা না করিয়া দুৰ্ব্বেরা যেমন কামের উপাসনা করিতেছে, সেইপ্রকার হইবে ; অর্থাৎ মহান লোকদিগের মহামহাত্ম্য

মুর্থদের নীচ-প্রবৃত্ত্যনুসারে নীচ ও মন্দ হইয়া জগতে বিরচন করিবে।

ভাই ! মন্দ অবস্থায় পড়িয়া আমি আর একটি জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাহা এই যে, আমি তুমি ইত্যাদি জন কয়েক লোক সত্য কেবল জানিতে পারিলেই, সমাজের ও আমার তোমার ইত্যাদি ব্যক্তিগত সত্যজ্ঞানের সম্পূর্ণ মঙ্গল হইবে তাহা ভাবা মহাভ্রম। প্রেম যে পবিত্র তাহা কেবল নব্যশিক্ষিতেরা জানে, সেকালেরা জানেনা। এই কারণে আমি এক জন দুবকেব সহিত প্রেম করিয়াছিলাম বলিয়া আজ আমার এত লাঞ্ছনা। তবে ব্যক্তিগত-সত্যজ্ঞানে সম্পূর্ণ মঙ্গল কোথা ? উহা সকলে না জানিবার ও কামকে সুখ জানিবার কারণ আত্মহত্যা, পরহত্যা, সুরাপান প্রভৃতি অসংখ্য পাপে সমাজ বধন ধ্বংস হইতেছে, তখন সমাজের সম্পূর্ণ মঙ্গল নাই এই কথা বলা বাহুল্য। যদিও আমি শুধু প্রেম-সত্য জানিবার কারণ অনেক পরিমাণে মানসিক দুঃখ লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু ঐ সত্য ব্যবহার করিতে না পারায় ঐ সত্যের সম্পূর্ণ জ্যোতি উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সত্যের সম্পূর্ণ দুঃখ লাভ করিতে পারিতেছি না। আমি যদি সমাজকে তুচ্ছ করিয়া আমার প্রণয়পাত্রের সহিত ঐ সত্যের ব্যবহার করি, তাহা হইলে ঐ সত্যের জ্যোতি অব্যবহারের অবস্থা-পেক্ষা অধিক বিকাশ হইয়া আমাকে সুখিনী করিতে পারে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সুখিনী করিতে পারে না ; কারণ সমাজ হইতে বিবিধ অঙ্গ আসিয়া আমাকে সম্পূর্ণ সুখিনী করিতে দিবে না। আমি বাহা বলিতেছি, এই সত্য আমার মত লোকদিগের উপর ঝাটিবে (বাহাদের ভাব অধিকাংশ)।

তবে যে মহাত্মারা সমাজের মঙ্গলের জন্য এবং সত্যের মর্যাদার জন্য কুসমাজ অগ্রাহ্য করেন, সমাজ হইতে অসংখ্য অত্র বাইরা তাঁহাদের কিছুই করিতে পারে না। কুসমাজ যদি শেষে তাঁহাদের জীবন লইতে বাসনা করে, তাহাতে তাঁহারা তীত হইয়া হুঃখিত হন না, এবং সমাজ তাঁহাদের জীবন লইয়াও তাঁহাদিগকে হুঃখ দিতে পারে না; কারণ সত্যের জন্য জীবন গেল ভাবিয়া সত্যপ্রিয়েরা সুখী হইলেন এবং সত্যের জন্য জীবন গেল এই কারণে সত্য যে স্বার্থসত্য বলিয়া সমাজে দৃঢ় হইবে এই ভাবিয়া সমাজ তাঁহাদের জীবন লইলে তাঁহাদিগকে হুঃখী করিতে পারে না, বরং অতিসুখী করে। আমার পূর্বোক্ত সত্য ঐ মহাত্মা লোকদিগের উপর আধিপত্য করিতে পারিবে না, আমার মত (বাহার ভাগ অধিকাংশ, ঈশ্বর করুন, আমার মত লোক যেন জগতে না থাকে, ঐ সত্য যেন লুকাইয়া যায়, মহাব্যক্তির উক্ত সত্য যেন থাকে) লোকদের উপর আধিপত্য করিবে। আমার মত অধিক লোক বলিয়া আমি পূর্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে, সমাজের বিশেষতঃ আমার মত ব্যক্তির আপনার মঙ্গলের জন্যও সত্য প্রচার করা অবশ্য করণীয় হইয়া উঠে।

তাই ! শুধু কথাতে কোন সত্য প্রচার করা যায় না, স্বয়ং সত্যানুভবে মোহিত হইয়া কার্য না করিলে ও সত্যানুভবে অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে বাতাইবার ইচ্ছায় সত্যানুভবে মোহিত হইবার কথাতে সত্য প্রকাশ না করিলে সত্যপ্রচার হয় না।

এক সময় আমি সাধারণের অন্তরে কোন সুমিষ্ট বস্তু পাইয়া ও তাহার নিরবস্থায় পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। অনন্তর

ভ্রাতাদিগকে আমি অত্যন্ত ভাল বাসিতাম, হুতরাং আমার ওধন ইচ্ছা হইরাছিল, ঐ দ্রব্য ভ্রাতাদিগকে আহার করাই। তৎপরে আমি ঐ দ্রব্যভোজনের আয়োদে আয়োদিত হইরা আয়োদিত প্রাণের কথার ভ্রাতাদিগকে বলিলাম, ভাতৃগণ! ইহা উত্তম দ্রব্য, তোমরা অনুগ্রহ করিয়া পরীক্ষা কর। তাহারা আমাকে ভাই জানিয়া আমার কথা বিশ্বাস করিল এবং উহা আহার করিয়া আয়োদিত হইল। এই ঘটনায় ব্যক্ত হইতেছে যে, আমি ভ্রাতাদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতাম এবং আয়োদিত প্রাণের কথার ভ্রাতাদিগকে বলিয়াছিলাম, ভ্রাতৃগণ! তাহারা অসম্মিতচিত্তে তাহা আহার করিয়াছিল। ঠিক ঐপ্রকারে ও ঐ নিয়মে সত্য-প্রচার হয়, নতুবা যে সত্য আজীবন আত্মদান করি নাই ও বাহ্য-দিগকে সত্য দিব, ভ্রাতাদিগকে ভাল বাসি নাই, কোন স্বার্থের জন্য আধুনিক স্বার্থপরায়ণ ধৃষ্টদর্শ বৈক্যবর্ধ প্রচারকদের মত শূন্যহৃদয় হইরা পরচর্চণচর্চিত ঈশ্বরপ্রেমসত্য প্রকাশনের ভার নৌখিক প্রকাশ করিলে সত্য প্রচার হয় না। এই কারণে বাহ্যিক জিজ্ঞাসিত ধৃষ্ট ও বৈক্যব নিবোরাও ওদের অনুরূপ হইরা থাকে।

বৈক্যবদের কথা উপস্থাপন করিতে গিয়া মনে একটা কথা আসিয়া উপস্থিত হইল। কথাটা এই যে, বৈক্যব-ধর্মের আবি-কারক চৈতন্য ও তাঁহার সহযোগীরা যদি আপনাদের মত সক-লকে (বাহ্যদিগকে শিষ্য করিবেন) মহৎকথা চিন্তা ও ধারণা করাইবার ক্ষমতা দিয়া তৎপরে আপনাদের মত ভ্রাতাদের নিকট প্রচার করিতেন এক দূর্ব্বকের নিকট সত্য প্রচার না করিতেন, তাহা হইলে বৈক্যবধর্মের এক দুর্লভ হইত না,

তাহা হইলে চৈতন্য ও তাঁহার সহযোগীদের কৃষ্ণ-প্রাধার প্রেম (জীবাশ্রয় ও পরমাত্মার আধ্যাত্মিক প্রেম) মহা-পাপী নরনারীর পাশববৃত্তির নাম হইত না এবং যুর্বেরা ঈশ্বর ও ঈশ্বরীকে পাপাসক্ত ভাবিয়া ও পাপের দণ্ড নাই ভাবিয়া পাপের শ্রোত বৃদ্ধি করিত না। চৈতন্য বা ভৎসহযোগীরা যদি শিষ্যদিগকে মহানু করিয়া তাহাদের নিকট ঐ মহৎকথা প্রচার করিয়া তাহাদিগকে আপনাদের মত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে চৈতন্য ও ভৎসহযোগীরা সংসার হইতে চলিয়া যাইলেও বৈষ্ণবধর্ম অক্ষত থাকিত, শুদ্ধ অক্ষত কেন, ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইত। এক বা কতিপয় জনের উপর কোন মহৎকার্য্যে-ভার রাখা উচিত নয়; কারণ মানবজীবন ক্ষণভঙ্গুর। এক বা কতিপয় জনের জীবন ক্ষণভঙ্গুর হইলেও মানবসমাজ ক্ষণভঙ্গুর নয়, এই কারণে মানবসমাজের উপর সত্যস্থাপকের ভার রাখা উচিত, সুতরাং এই কারণেও মানব-সমাজকে আপনাদের মত মহানু করিতে চেষ্টা করাও উচিত। চৈতন্য ও ভৎসহযোগীরা এবং শিষ্যধর্মনারক মহাত্মা গুরুগোবিন্দ সিংহ উহা করেন নাই বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ও শিষ্যধর্ম অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই দুই ধর্ম আছে বটে, কিন্তু মৃতদেহবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, সুতরাং আপনা হইতে গলিয়া যাইতেছে।

তাই। তোমার যদি কোন সত্য যথার্থরূপে প্রচার ও চিরস্থায়ী করিতে এবং সত্যাবলম্বীদিগকে তাহার ফল ভোগ করাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে সকলকে বা বাহাদিগকে সত্য দিবে তাহাদিগকে আপনাদের মত উন্নত করিয়া তুল। পূর্বেই বলিয়াছি,

সুখ, প্রকৃত সুখ হইত ও প্রকৃত ভাল, প্রকৃত মন হইয়া যাইত এবং যদি ভাল, মন, সুখ ও সুখ বলিয়া প্রকৃত কোন বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে পাপিষ্ঠ দানববংশে পুণ্যাত্মা প্রজ্ঞানদের ও পাপিষ্ঠ ইচ্ছাবংশে পুণ্যধরূপ বীতবৃষ্টের আবির্ভাব হইত না। কেবল সংসার বশতঃ সুখ, দুঃখ, ভাল, মন যদি হয়, তাহা হইলে, তাঁহাদের অভ্যপ্রকার উৎকৃষ্ট ওণ কোথা হইতে আসিল বা ঐ পাপীদের সুখ, দুঃখ, ভাল, মন তাঁহাদের কেন হইল না ? তাঁহারা কাহাদের নিকট সংসার পাইয়া ভাল, মন, সুখ, দুঃখ জানিলেন ? এতদ্বত্তরে অবশ্য বলিতে হইবে, সুখ, দুঃখ, ভাল, মন আত্মা হইতে উৎকৃষ্ট হয় ; সংসারে বা অভ্যাসে ইহাদের কখন কোন পরিবর্তন হয় না ; যদি হইত, তবে তাঁহাদের কেন হইল না, এবং চিরপিঞ্জরবদ্ধ পাখী ও চিরপরাধীন জাতি স্বাধীনতার জন্ত কেন উৎসুক হইত ? প্রকৃত মন যদি অভ্যাসে প্রকৃত ভাল হইয়া যাইত, তাহা হইলে বুদ্ধদেব অধিক বরসে সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন না। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা অনাবশ্যক। তোমার ঐ কথা বে অসার তাহা বৃষ্ট, প্রজ্ঞান ও থাক্যসিংহ সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

আমি বলি, এক নিয়মে এক সত্য সর্ব সময়ে আবদ্ধ নহে, এই কথা এক সুখসত্যের নিকট প্রমাণিত হইতেছে। দেখ, এমন কতকগুলি সুখ (যেমন ভোগসুখ) আছে, নিত্য অভ্যাসে তাহাদের অনুভব হয় না ; নিত্য পায়সায় পাইয়া কে কবে সুখী হয় ? আবার এমন কতকগুলি সুখ আছে, বাহ্য অভ্যাসে দ্বারী হয়, অনভ্যাসে পলাইয়া যায় (যেমন শাস্ত্রচর্চা, পরোপকার প্রভৃতি)। ঐপ্রকার সুখসত্য ব্যবহার কর, দুঃখ হইবে

না। আমি ঐপ্রকার সুখসত্যের মত সত্যকে অপরিবর্তনীয় বলিতেছি এবং ঐপ্রকার সত্যকে আমি প্রকৃত সত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। ভোগসুখ প্রকৃতি সত্যকে (বাহ্য নিত্য ব্যবহারে হুঃখে পরিণত হয়) আমি প্রকৃত সত্য বলিতে পারি না। তুমি ঐপ্রকার সত্য দেখিয়া ঐপ্রকার সব সত্য অনুমান করিয়া বহিঃ উর্ক কব, তবে তুমি ভ্রমে পড়িবে। বাহ্য কণেক মিথ্যা, কণেক সত্য, কণেক সুখ, কণেক হুঃখ, তাহাকে মূল ভাবিয়া উর্ক কবা অবिवেচকের কার্য্য, তখাচ আমি উহাদিগকে অগৎ হইতে তুলিয়া দিতে ইচ্ছুক নই; কাবণ সুখ-মাত্রকেই অগতে রাখা কর্তব্য। যে সুখ অভ্যাসে হুঃখ হয়, তাহাকে সময়ে সময়ে ভোগ কর, কখনই তাহা হুঃখ বোধ হইবে না।

হুঃখবর । আর একটি কথা শুনি, বহু ভৎসনা ও প্রহারের পর শান্তডী-ঠাকুরাণীব প্রেরিতা একজন শিক্ষিতা রমণী আমাকে একদিন নির্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন, ভগিনি। তুমি কেন পাপপথে বাইতেছ ?

আমি । পাপশূভ দাম্পত্য-প্রেমটীও কি পাপ ?

শিক্ষিতা । তাহাতেও পবম্পব পরম্পরের নিকট ভাল-বাসা-সুখ পাঁইবার আশা আছে, সুখের আশার কার্য্য করাই পাপ। সুখের কামনা ছাড়িয়া সংকার্য্য কর এবং কার্য্যের কল ইন্দ্রকে অর্পণ কর।

শিক্ষিতার নিকট এই কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। সেই সময় হইতে অন্য পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, সুখের আশা তির আমাদেব জীবন কোন কার্য্যেই

প্রবৃত্ত হয় না। আমাদের বাহ্য জীবন, ভাহার আহারীয় বস্তু একমাত্র সুখ। যিনি যে বস্তু আহাৰ করেন, তিনি সেই বস্তুর রূপান্তরমাত্র, সুতরাং জীবনের অপর নাম সুখ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়। নিকামধর্মে আমাদের প্রকৃত সুখ লাভ হয় বলিয়া আমাদের জীবন তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, নতুবা কখনই হইত না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, এক সত্য সর্বসময়ে এক নিয়মে আবদ্ধ নহঁ, এইঅন্ত কতকগুলি সুখ আশা না করিলে পাওয়া যায় না, আবার কতকগুলি সুখ আশা না করিয়া পাওয়া যায়, পরোপকার-কার্যে বাহ্যিক সুখের আশা করিলে সুখ পাওয়া যায় না এবং সুখের আশা না করিলে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়। এই কারণে আমাদের জীবন পরোপকার প্রভৃতি নিকাম কার্যে সুখের আশা না করিয়া প্রবৃত্ত হয়। নিকাম কার্যেও বধন জীবন সুখ ভিন্ন প্রবৃত্ত হয় না, তখন এমন কোন কার্য নাই বাহাতে জীবন সুখ ভিন্ন প্রবৃত্ত হয়, এবং কোন কার্যকেই প্রকৃত নিকাম বলিতে পারা যায় না। বাহ্য বা অন্তরে বধন কার্যমাত্রেরই সুখের আশা থাকে, তখন কি করিয়া কোন কার্য নিকাম হইতে পারে? নিকাম কথাটা তাহা হইলে “শশকের শিং” এই কথার মত অর্থশূন্য হইয়া পড়ে।

কার্যের ফল সুখ ভিন্ন জীবন বধন তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না, এবং সুখভোগ না করিয়া থাকিতে পারে না, তখন ঈশ্বরকে বেওয়া কথাটা মিথ্যা যোজনা করিয়া তাহার আলোচনা করা বৃথা। বাহ্য জীবনে বাহ্যিক ও আন্তরিক সুখের আশা নাই, সুতরাং সুখ নাই, সেই সুখশূন্য শুদ্ধ জীবনকে ধার্মিকের জীবন বলিয়া

ঘোষণা করা নিতান্ত অধার্থিকের কার্য। বাহা জগতের অনিষ্টকর তাহাকে, সুখ আমি কেন, জানিমাতেই পাপ বলিয়া ঘোষণা করেন। আমি ঐপ্রকার সুখশূন্য জীবনকে পাপজীবন না বলিয়া থাকিতে পারি না। আমি নিশ্চয় জানি, বাহারা নিকামধর্মের চিত্র আঁকিয়া জগতে নিকাম ধর্ম প্রচার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাঁহারা মুকামনা- (বাহ্যিক সুখাশাহীন কামনা) পূর্ণ সুন্দর জীবন দেখিয়া মোহিত হইয়া তাহাকেই নিকামজীবনচিত্র আঁকিয়াছেন। সরসতাপূর্ণ সৌন্দর্য্যই লোকের মোহিত হইবার কারণ। তাঁহারা যখন নিকাম জীবন দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন, তখন নিকাম জীবন নিশ্চয় সরসতাপূর্ণ সৌন্দর্য্য, সরসতার কারণ শান্তিপূর্ণতা, শান্তি-পূর্ণতাই সুখপূর্ণতা, সুতরাং নিকাম জীবন বে সুখপূর্ণ তাহা নিশ্চয়। আমার বিশ্বাস, সুখশূন্য-জীবন-চিত্র পর-
| হিতৈষীরা আঁকিতে পারেন না, কারণ তাঁহাদের কার্য অস্ত্রকে সুখ দেওয়া ; সুতরাং নিকাম জীবন বে সুখময়, উহাকে বিশ্বশ্রেমকেরা যখন আঁকেন, ও সকলকে নিকামধর্মাবলম্বী হইতে যখন উপদেশ দেন, তখন উহা বে নিশ্চয় সুখ এই কারণেও স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। ভাই। তুমি বিরক্ত হুইবে বলিয়া অদ্য আমি বিদায় লইলাম, বারান্তরে অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল ।

তোমার

শ্রীমতী সুনীলাসুন্দরী দেবী ।

প্রকাশক — শ্রীপ্রিয়নাথ দাস

জেলা মেদিনীপুর, পায়রাশিখাম।

প্রিণ্টর—শ্রীকেশবমোহন মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা—আমহাট স্ট্রীট ৫৬ নং

